Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আমলী অধঃপতনে আমার যা করণীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নওশীন নাওয়াল

রোলঃ 228021995

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আমলী অধঃপতনে আমার যা করণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নওশীন নাওয়াল

রোলঃ 228021995

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আমলী অধঃপতনে আমার যা করণীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নওশীন নাওয়াল , আইডিঃ 228021995 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আমলী অধঃপতনে আমার যা করণীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

নওশীন নাওয়াল

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

নওশীন নাওয়াল

আইডিঃ 228021995

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা..6

আমল কী? 8

আমলের ফজিলত কি?..9

আমলের অধঃপতন কি? 10

আমলের অধঃপতন কেন হয়?... 13

১)তাকওয়ার অভাব : নেক আমলে অনীহার প্রধান কারণ তাকওয়ার অভাব। 13

২)ইলমের অভাব: বিভিন্ন নেক আমলের অনেক গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছে। 14

৩)আখিরাতের ব্যাপারে গাফিলতি : আখিরাতে নেক আমলের সুফল এবং 14

৪)অসৎসঙ্গীর প্রভাব : অসৎসঙ্গীর প্রভাবেও নেক আমলে অনীহা সৃষ্টি হয়। 15

৫)গুনাহের প্রভাব : গোনাহের দ্বারা অন্তর প্রভাবিত হয়। গোনাহের পরিমাণ যত 15

৬)পরিবেশের প্রভাব : মানুষ পরিবেশের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। 16

৭)শয়তানের কুমন্ত্রণা : শয়তানের প্রধান কাজই হলো মানুষের অন্তরে নানা 16

৮)নফসের কুপ্ররোচনা : মানুষের নফস নেক আমলের জন্য কোন ধরণের কষ্ট 17

৯)মন্দ লোকের সমালোচনা : সমাজে কিছু কুলাঙ্গার আছে যারা কাউকে নেক 17

১০)দুনিয়ার মোহ : মানুষের নেক আমলে গাফলতির অন্যতম প্রধান কারণ 17

১১)অলসতা:অলসতা হলো শয়তানের মূল তীর।অলসতা কর্মবিমুখতা ও 18

১২)হারাম ভক্ষণ :হারাম ভক্ষণ ও হারামের উপর জীবন যাপন কবীরা 18

১৩)সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তি:.. 20

১৪)দোয়ার ঘাটতি 21

১৫)অশ্লীলতা:... 22

১৬)অহংকার:.. 23

আমলে অধঃপতনের প্রভাব.. 24

১)ব্যক্তি জীবনে:.. 24

আল্লাহর অসন্তুষ্টি :... 24

নির্দয় হওয়া :... 24

বরকত উঠিয়ে নেওয়া :... 25

বালা মুসিবত লেগে থাকা... 25

দোয়ার বরকত উঠে যাওয়া : 25
নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া 26
পারিবারিক কলহ ও অশান্তি: 26
রহমত উঠে যাওয়া: 27
ধর্মীয় পরিবেশের অবক্ষয় 27
৩)সামাজিক জীবনে:আমলে অনীহা সামাজিক জীবনে যে প্রভাব ফেলতে পারে তা হলো: 28
ফরয আমল পরিত্যাগের শাস্তি 30
১)ফরজ নামাজ তরক করার শাস্তি : 30
২) রোজা বর্জন করার শাস্তি 32
৩)যাকাত না দেওয়ার শাস্তি 33
৪)হজ না করার শাস্তি 34
আমলী অধঃপতনে আমাদের যা করণীয় 35
১)গুনাহ চিন্হিতকরণ ও ত্যাগ করা: 35
২)তওবা করা: 36
৩)দোয়া করা: 39
৪)ইলমে নাফী অর্জনের চেষ্টা করা: 41
৫)নেক সহবতের ব্যবস্থা করা 43
৬)আখিরাতকে স্মরণ করা: 45
৭)সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার কমানো: 46
৮)কুরআনকে আকড়ে ধরা: 47
৯)সালাতে নম্র ও বিনয়ী হওয়া: 48
১০)তাকওয়া অর্জন করা: 50
১১)নজরের হিফাজত করা: 53
১২)গান-বাজনা পরিহার করা:গান 54
১২)দান-সাদাকা করা: 55
উপসংহার 57

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। অগণিত দরুদ ও সালাম প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।আমাদের মাঝে একের পর এক ইবাদত ও কল্যাণের মৌসুম আগমন করতেই থাকে, আর বারবার সুযোগ ও উপলক্ষ আসতে থাকে। বিচক্ষণ ব্যক্তি এ সময় নিজেকে উচ্চমর্যাদায় নিয়ে যায়, ইমানের খোরাক জোগায় ও তার ভান্ডারকে আরও শক্তিশালী করে।

এ মৌসুমগুলো যখন অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন অনেকের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে; আমলের তৎপরতা দুর্বল হয়ে আসে ও উদ্যমতা কমে যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক কর্মের উদ্যমতা আছে এবং প্রত্যেক উদ্যমতার সঙ্গে আছে নিরুদ্যমতা। সুতরাং যার নিরুদ্যমতা আমার সুন্নাহর গণ্ডির ভেতরে থাকে, সে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয় এবং যার নিরুদ্যমতা এ ছাড়া অন্য কিছুতে (সুন্নত বর্জনে) অতিক্রম করে, সে ধ্বংস হয়ে যায়।' মুসনাদে আহমাদ

এটা আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, যেন বছরব্যাপী আমলের জন্য নিরাপদ পন্থা ও সুদৃঢ় নির্দেশিকা সম্পর্কে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করি। এ ক্ষেত্রে আমরা স্বস্তিদায়ক জবাব ও পরিপূর্ণ জ্ঞান পেতে পারি নবী করিম (সা.)-এর আদর্শ থেকে. যা উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা (রা.) প্রকাশ করেছেন। যখন আলকামা (রহ.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, নবী করিম (সা.)-এর আমল কেমন ছিল? তিনি কি কোনো দিনকে কোনো আমলের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতেন? উত্তরে হজরত আয়েশা (রা.) বললেন, 'না, বরং তার আমল স্থায়ী হতো।' সহিহ বোখারি

অর্থাৎ তিনি সর্বদা আমল করতেন, ছেড়ে দিতেন না। তা ছাড়া হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় আমল তাই যা সদাসর্বদা নিয়মিত করা হয় যদিও তা অল্প হয়।' সহিহ বোখারি

নববি এ আদর্শ এবং ইবাদতের এ নীতি স্রষ্টার সঙ্গে ব্যক্তির স্থায়ী সম্পর্ক তৈরি করে এবং তাকে স্বীয় রবের অভিমুখী করে। অল্প আমল হওয়া সত্ত্বেও তা নিয়মিত পালন করা একটি সরল পথ ও মধ্যপন্থা। এটা অন্তরের জন্য মানানসই; তাতে আপনি কষ্ট অনুভব করবেন না। বরং এ অল্প আমল ভিন্নভিন্ন হওয়ার কারণে

তার প্রতি হৃদয় আরও উদগ্রীব ও অগ্রসর হয়। নিয়মিতভাবে স্বল্প আমল অনেক; তা বিশুদ্ধ নিয়তের সঙ্গে বহুগুণ বর্ধিত হয় এবং হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে। জেনে রাখুন, আপনার দৃষ্টিতে যে সময়টিকে আপনি নগণ্য মনে করছেন, সেটাকে যদি স্থায়ী আমল দ্বারা সদ্ব্যবহার করেন; তাহলে যেন আপনি জীবনের এ সময়টিতে অনেক কিছুই সম্পাদন করলেন।

হাদিসটি এদিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করে যে, শুধু আমলের চেয়ে আমলের ওপর অবিচল হওয়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত আসল বিষয় হলো, আমল শুরু করুন ও তা চালিয়ে যান। যে ব্যক্তি নিয়মিত আমল করে যায় সে সম্মান ও মর্যাদার শিখরে উন্নীত হয়। 'যা সদাসর্বদা নিয়মিত পালন করা হয় যদিও তা অল্প হয়।' নববি এ উচ্চ মূলনীতিটি মেনে চলেছেন হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবিরা। তারা শ্রেষ্ঠ গুণাবলির ঝরনা থেকে সুধা পান করেছেন; ফলে এর দ্বারা তারা এমন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন, যারা অনুসরণীয় এবং তারা এমন আদর্শ হয়েছেন যাদের পদাঙ্ক অনুকরণীয়। তাদের প্রত্যেকেই নফল আদায়ের সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে তার প্রতি দ্রুত অগ্রসর হয়েছেন। সে আমলই পছন্দ করতেন যা পালন করতে সক্ষম হতেন, সে ইবাদত বাছাই করতেন যার প্রতি হৃদয়ের টান অনুভব করতেন; নামাজ, দান-সদকা, সদাচরণ, সম্পর্ক রক্ষা ইত্যাদি। তারা এগুলো পালনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতেন, এসব আমলের ওপর অবিচল থাকতেন। ফলে তারা আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় মানুষে পরিণত হন।

সহিহ মুসলিমে এসেছে, উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, 'যে ব্যক্তি দিবা-রাতে বারো রাকাত (সুন্নত) নামাজ আদায় করবে, তার প্রতিদানে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হবে। উম্মে হাবিবা (রা.) বলেন, যখন আমি হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে এ কথা শুনেছি তখন থেকে এই নামাজগুলো কখনো ছাড়িনি।'

হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবার-পরিজন কোনো আমল শুরু করলে তা স্থায়ীভাবে সর্বদাই করতেন।' সহিহ মুসলিম।এ থেকে বোঝা যায়,আমল শুধু করলেই হবে না তা স্থায়ী ও হতে হবে।

আমল কী?

আমল’ শব্দটি আরবি। আর আরবি শব্দের বৈশিষ্ট্য হলো একটি শব্দের অসংখ্য প্রতিশব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে। সেজন্য ‘আমল’ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ করতে গিয়ে দেখা গেছে ‘আমল’ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় ‘কাল’ বা সময়, যেমন জাহেলি আমল কিংবা আব্বাসীয় আমল। ‘আমল’ এর দ্বিতীয় অর্থ হলো ধনসম্পদ; যেমন সুরা নিসার ২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, ‘এতিমের ধন সম্পদ তাদের কাছে দিয়ে দাও, ভালো জিনিসের সঙ্গে খারাপ জিনিস বদল করো না। এ আয়াতে ‘আমল’কে সম্পদ হিসেবে অর্থ করা হয়েছে। ‘আমল’ এর তৃতীয় অর্থ হলো মূল্যায়ন বা গুরুত্ব দেওয়া; যেমন : বিষয়টিকে আপনি আমলেই নিলেন না? ‘আমল’ এর চতুর্থ অর্থ হলো কাজ বা কর্তব্য। যেমন সুরা আসরে বলা হয়েছে, ‘যারা ইমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে। এখানে সুরা

আসরে যে ‘আমল’-এর কথা বলা হয়েছে, এই আমলের অর্থ হলো আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.) যা যা করতে বলেছেন, সেসব করা আর যা যা নিষেধ করেছেন, সেসব না করাকে বোঝানো হয়েছে। আর ইবাদত শব্দের অর্থ হলো দাসত্ব করা। অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.) যা করতে বলেছেন ও যা নিষেধ করেছেন, সেসব করা না করাকেই ইবাদত বোঝায়। আবার এভাবেও বলা যায়, শরিয়ত মতে নিজেকে ও নিজের পরিবার-পরিজনকে পরিচালিত করার নাম ইবাদত। নামাজ পড়া যেমন ইবাদত, তেমনি প্রতিবেশী প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়াও ইবাদত। হজ করা যেমন ইবাদত, তেমনি জুলুম, অত্যাচার ও বৈষম্যের বেড়াজাল থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করাও ইবাদত। যাকাত দেওয়া যেমন ইবাদত, তেমনি দুর্বল মানুষকে আর্থিক ও মানবিক সাহায্য করাও ইবাদত। এসব ইবাদত একটি বাদে অন্যটি অসম্পন্ন। ইবাদত ও আমল শব্দ দুটি একে অন্যের পরিপূরক।

আমলের ফজিলত কি?

মানুষকে পরকালে আল্লাহ তায়ালার শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে তার নেক আমল ও ভালো কাজ। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তায়ালা নেক আমলকারীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে,

اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ جَنّٰتُ النَّعِیۡمِ - خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَا ؕ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ

যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে,তাদের জন্য আছে নেয়ামতে ভরা জান্নাত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সুরা লোকমান, আয়াত, ৮-৯)

অপর আয়াতে আরও বলা হয়েছে,

اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ کَانَتۡ لَهُمۡ جَنّٰتُ الۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا

'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের মেহমানদারির জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস।' (সুরা কাহফ, আয়াত, ১০৭)

নেক আমল যত ছোট বা অল্পই হোক না কেন, এর প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই দেবেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَمَنۡ یَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّۃٍ خَیۡرًا یَّرَهٗ - وَ مَنۡ یَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّۃٍ شَرًّا یَّرَهٗ

'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।' (সূরা যিলযাল, আয়াত, ৭-৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো-তা এক টুকরা খেজুর দান করার বা একটি ভালো কথা বলার বিনিময়েই হোক না কেন'। (বুখারি, হাদিস, ৬৫৪০)

অপর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, 'কোন সৎকাজকেও সামান্য ও নগণ্য মনে করো না, যদিও তা কোনো পানি পার করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির পাত্রে এক মগ পানি ঢেলে দেওয়াই হয় অথবা তোমার কোনো ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত

করাই হয়।’ (মুসনাদে আহমাদ, ৫/৬৩)
কেন কাজের প্রতিদান এবং পুরস্কার পরকালে মিলবে এ কথা তো হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত। তবে পৃথিবীতেও নেক আমলকারীরা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কিছু নেয়ামত ও বরকত লাভ করে থাকেন। এখানে নেক আমলকারীদের দুনিয়াবী কিছু উপকার তুলে ধরা হলো-

>> নেক আমলের কারণে উপার্জনে বরকত হয়।

>> কষ্ট ও অশান্তি দূর হয়।

>> মনের ইচ্ছা পূরণ হয়।

>> জীবনে শান্তি আসে।

>>আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত লাভ হয়।

>> বৃষ্টি হয় ঠিকমতো।

>> বিপদআপদ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

>> আল্লাহ তায়ালা সব কাজে সাহায্য করেন।

আমলের অধঃপতন কি?

দ্বিনের ওপর অটল ও অবিচল থাকা একজন মুমিনের আবশ্যকীয় বিষয়।

দুনিয়ায় বিভিন্ন ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু শত বাধাবিপত্তির মধ্যেও নিজেকে দ্বিনের ওপর অবিচল রাখা কর্তব্য। মহান

আল্লাহ বলেন, ‘সুতরাং আপনি আহ্বান করুন এবং দৃঢ় থাকুন, যেভাবে আপনি

আদিষ্ট হয়েছেন।আর আপনি তাদের খেয়াল-খুশিরঅনুসরণ করবেন না।’

(সুরা:আশ শুরা,আয়াত:৪২)

যারা দ্বিনের ওপর অবিচল থাকবে, তাদের ব্যাপারে আছে সুসংবাদ। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, ‘নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ, তারপর অবিচল থাকে, তাদের কাছে নাজিল হয়।ফেরেশতা এ বলে যে তোমরা ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার জন্য আনন্দিত হও।’ (সুরা :ফুসসিলাত,আয়াত:৩০)

হিদায়াত হলো একজন বান্দাকে দেয়া আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিয়ামত।হিদায়াত পাওয়া যত কঠিন হিদায়াত এর উপর অটল থাকা তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন।আর হিদায়াত এর পথে টিকে থাকার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ভালো আমল জারি রাখা।এবার আমার ব্যক্তিগত কথায় আসা যাক।

আমার হিদায়াত পাওয়ার প্রথম দিকের আমলের কথা চিন্তা করে এখনো চোখে পানি চলে আসে।কতটা সুন্দর ছিলো সেই আমল।খুব বেশি সূরা পারতাম না কিন্তু নামাজে মনোযোগের কোনো অভাব ছিলো না,খুব বেশি দোয়া

পারতাম না কিন্তু সিজদা থেকে যেনো মাথাই উঠতো না,ভালোভাবে কুরআন পড়তে পারতাম না কিন্তু মুহাব্বতের সাথে প্রতিদিন একবার হলেও কুরআন টা নিয়ে বসা হতো।আর এখন সব মোটামুটি শিখেছি কিন্তু নামাজে মনোযোগ আসে না,দোয়া করতে যেনো ভুলেই যাই,কয়েকদিন কুরআন না পড়লেও ভিতর থেকে কোনো কষ্ট আসে না।আগে যেখানে কোনো এলার্ম ছাড়া তাহাজ্জুদের জন্য উঠে যেতাম এখন এলার্ম দিয়েও যেনো ফজর এর জন্য উঠতে পারি না।কিন্তু কেন?কেনো আমার রবের সাথে এতো দুরুত্ব?আমি তো হিদায়াতের যোগ্য ছিলাম না আমার রবই তো আমাকে এই নিয়ামত দিয়েছেন।কিন্তু এখন কেনো আমি এতোবড় নিয়ামত থেকে দূরে সরে যাচ্ছি?কেনো দিন দিন আমার আমলের এতো অধঃপতন হচ্ছে?কিভাবে আমি আবারও আমার আমল পূর্বের মতো ঠিক করতে পারি?মুমিন জীবনে

নেক আমলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নেক আমল ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত কিংবা মুস্তাহাব যাই হোক প্রতিটির আলাদা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করে চিরস্থায়ী সুখময় জান্নাতলাভের জন্য ঈমানের সঙ্গে নেক আমলও অপরিহার্য। এরপরও নেক

আমলের ব্যাপারে আমরা অনেকে চরম অবহেলা প্রদর্শন করি। নেক আমল করতে আমাদের অনেকের কাছে একদম ভালো লাগে না। নেক আমলে অনীহা আমাদের জীবনে অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনে।

আমলের অধঃপতন কেন হয়?

নেক আমলে অনীহার অনেক কারণ রয়েছে।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ সম্পর্কে কোরআন-হাদিসের আলোকে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১)তাকওয়ার অভাব : নেক আমলে অনীহার প্রধান কারণ তাকওয়ার অভাব।

যার অন্তরে তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় আছে, সে নেক আমলে অনীহা প্রদর্শন করতে পারে না। তাকওয়া মানুষের অন্তরে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির ভয় সৃষ্টি
করে। এর ফলে নেক আমলে আগ্রহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। তাকওয়া মানুষের অন্তরে ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্যবোধ সৃষ্টি করে এবং সত্যপথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে।

আল্লাহতায়ালা এ ব্যাপারে বলেন, ‘যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের ওপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের
বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।’ (সুরা আল-আরাফ, আয়াত-২০১) অন্য আয়াতে আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেছেন, ‘হে ঈমানদারগণ তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তবে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন এবং তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন।

বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত মহান।' (সুরা আনফাল, আয়াত-২৯)

২)ইলমের অভাব: বিভিন্ন নেক আমলের অনেক গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছে।

এসব অনেকেই জানে না। ফলে এসব আদায়ের নিয়মপদ্ধতি সম্পর্কে যথাযথ ইলম অর্জনেও তারা কোনো চেষ্টা করে না। আর ইলম ছাড়া সঠিকভাবে নেক আমল আদায় করা সম্ভব নয়। এর ফলে নেক আমলেও তাদের অনীহা দেখা যায়। এছাড়া জ্ঞানহীনদের হৃদয়ে আল্লাহতায়ালা মোহর মেরে দেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'এমনিভাবে আল্লাহ জ্ঞানহীনদের হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দেন।' (সুরা রুম, আয়াত- ৫৯) তাই নেক আমলে আগ্রহ সৃষ্টির

জন্য প্রয়োজনীয় ইলম অর্জনের বিকল্প নেই। কওমের কিছু লোকদের দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করে অন্যদের সতর্ক করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক

দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ

দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে।, (সুরা তাওবা, আয়াত- ১২২)।এ থেকে বুঝা যায় ইলমের অভাব আমলের অধঃপতনের অন্যতম কারণ।

৩)আখিরাতের ব্যাপারে গাফিলতি : আখিরাতে নেক আমলের সুফল এবং নেক আমলে অবহেলার ভয়াবহ পরিণতির ব্যাপারে অনেকে সচেতন নয়। আখেরাতের ব্যাপারে তারা চরম গাফেল। আবার অনেকে আখেরাতের জীবন বিশ্বাসই করে না। এর ফলে নেক আমলেও তাদের তেমন আগ্রহবোধ পয়দা হয়

না। এ সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের

অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকার প্রদর্শন করেছে।' (সুরা নাহল, আয়াত-২২)

৪)অসৎসঙ্গীর প্রভাব : অসৎসঙ্গীর প্রভাবেও নেক আমলে অনীহা সৃষ্টি হয়।

অসৎসঙ্গী নেক আমলের পথে বড় প্রতিবন্ধক। অসৎসঙ্গীর প্রভাবে অনেক সৎ ছেলেও বিপথগামী হয়ে যায়। তাই সৎ লোকদের সঙ্গে থাকার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।' (সুরা তাওবা, আয়াত-১১৯) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 'যারা অসৎ সঙ্গ

গ্রহণ করে তাদের আফসোসের কোনো সীমা থাকবে না। অসৎ সঙ্গ গ্রহণকারীর আফসোস সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।' (সুরা ফুরকান, আয়াত-২৮)

৫)গুনাহের প্রভাব : গোনাহের দ্বারা অন্তর প্রভাবিত হয়। গোনাহের পরিমাণ যত

বৃদ্ধি পায় অন্তরে এর কুপ্রভাব তত বেশি পড়ে। যে অন্তর গোনাহের কাজে মজা

অনুভব করে সে অন্তরে নেক আমলের আগ্রহ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। তাওবা না করে অনবরত গোনাহ করতে থাকলে একসময় নেক আমলের প্রতি আগ্রহ একদম কমে যায়। তখন নেক আমল করতে আর ভালো লাগে না। গোনাহ মানুষের হৃদয়ে মরিচা ধরায়। এ সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'কখনও না, বরং

তারা যা করে, তা-ই তাদের হৃদয় মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।' (সুরা মুতাফফিফীন, আয়াত-১)

৬)পরিবেশের প্রভাব : মানুষ পরিবেশের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। অনেককে দেখা যায়, ভালো কোনো পরিবেশে থাকলে নেক আমলের ব্যাপারে বেশ ভালো আগ্রহ থাকে। কিন্তু খারাপ পরিবেশে সেই আগ্রহ একদম থাকে না। পরিবেশ সবসময় অনুকূল হবে না। তাই বলে কি আমরা প্রতিকূল পরিবেশের অজুহাতে নেক আমল ছেড়ে দেব? অবশ্যই আমরা তা করব না। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হলো প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূল পরিবেশে পরিণত করার জন্য যথাযথ চেষ্টা করা। পরিবেশ পরিবর্তনের চেষ্টা সফল না হলে অন্যত্র অনুকূল পরিবেশে যেতে হবে। পবিত্র কোরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে, ‘আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহতায়ালার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রূপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা
না হলে তোমরাও তাদেরই মতো হয়ে যাবে। আল্লাহ দোযখের মাঝে মুনাফেক ও
কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন।’ (সুরা নিসা, আয়াত-১৪০)

৭)শয়তানের কুমন্ত্রণা : শয়তানের প্রধান কাজই হলো মানুষের অন্তরে নানা
ধরনের কুমন্ত্রণা ঢেলে দেওয়া। শয়তানের কুমন্ত্রণা মানুষকে নেক আমল হতে উদাসীন করে রাখে। এজন্য সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকতে হবে। যারা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয় শয়তান তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেওয়ার সুযোগ
পায়। আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে
নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার
সঙ্গী। শয়তানরাই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে।’ (সুরা যুখরুফ, আয়াত-৩৬, ৩৭)

৮)নফসের কুপ্ররোচনা : মানুষের নফস নেক আমলের জন্য কোন ধরণের কষ্ট

স্বীকার করতে চায় না। এজন্য নেক আমলের ব্যাপারে সে চরম অবহেলা প্রদর্শন
করতে চায়। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনুল কারীমে আল্লাহতায়ালা হজরত ইউসুফ (আ.) এর উক্তি বর্ণনা করেন, ‘আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ। কিন্তু সে নয়, আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু।’ (সুরা ইউসুফ, আয়াত-৫৩)

৯)মন্দ লোকের সমালোচনা : সমাজে কিছু কুলাঙ্গার আছে যারা কাউকে নেক

আমল করতে দেখলেই তার সমালোচনা শুরু করে। অনেক ভীতু লোক সমালোচনার ভয়ে নেক আমলের ব্যাপারে অনীহা প্রদর্শন করে। কারো সমালোচনা ও উপহাসকে তোয়াক্কা না করে নেক আমল করে যেতে হবে। কেননা
সব নবী-রাসুলের সাথেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল এবং তাদের সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এর কোনো ভ্রুক্ষেপ করেনি। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, ‘এমনিভাবে, তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোনো রাসুল আগমন করেছে, তারা বলেছে : জাদুকর, না হয় উম্মাদ।’ (সুরা যারিয়াত, আয়াত-৫২)

১০)দুনিয়ার মোহ : মানুষের নেক আমলে গাফলতির অন্যতম প্রধান কারণ

দুনিয়ার মোহ। অনেকে দুনিয়ার মোহে অন্ধ হয়ে পরকালকে বেমালুম ভুলে যায়।
সেই সাথে নেক আমলের প্রতি সামান্যতম আগ্রহও তার থাকে না। তাই দুনিয়ার
মোহ হতে বাঁচতে হবে। আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে।’ (সুরা তাকাছুর, আয়াত-১) যারা আখেরাতের চেয়ে দুনিয়ার

জীবনকে বেশি গুরুত্ব দেয় তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, ‘যারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে; আল্লাহর পথে বাধা দান করে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে, তারা পথ ভুলে দূরে পড়ে আছে।’ (সুরা ইবরাহিম, আয়াত-৩)।

১১)অলসতা:অলসতা হলো শয়তানের মূল তীর।অলসতা কর্মবিমুখতা ও হীনমন্যতা তৈরি করে। জীবনের সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয়। কর্মবিমুখ ও নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিকে অন্যরা পছন্দ করে না। ভাবলেশহীন কিংবা উদাসীন মানুষকে সবাই অবহেলার চোখে দেখে।তাই অলস ব্যক্তির জীবন ফলপ্রসূ ও কর্মমুখর হয় না। কর্মহীনতা, নির্লিপ্ততা ও আলস্য নিজের জন্য যেমন কিছু করতে পারে না; তেমনি
সমাজ ও অন্যদের জন্যও তেমন কিছু উপহার দিতে পারে না। উপরন্তু অনেক অলস আশপাশের লোকদের জন্য অবক্ষয় ডেকে আনে। তেমনি ভাবে আমলের ক্ষেত্রেও অলসতা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে।অলসতার কারণে অজস্র ফজর কাযা হয়ে যায়,সারাদিন অনেক সময় থাকলেও কুরআন পড়ার সময় হয় না।এসব হয় মূলত অলসতার জন্য।

১২)হারাম ভক্ষণ :হারাম ভক্ষণ ও হারামের উপর জীবন যাপন কবীরা গুনাহগুলোর অন্যতম। তা যে কোন উপায়েই হোক না কেন।বর্তমান যুগের দর্শন
তো খাও, দাও, ফুর্তি করো। এ দর্শন বাস্তবায়নের জন্য সকলেই উঠে-পড়ে লাগছে। সবার মধ্যে শুধু সম্পদ সঞ্চয়েরই নেশা। চাই তা চুরি করে হোক অথবা
ডাকাতি। সুদ-ঘুষ খেয়ে হোক অথবা ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে। কোন অবৈধ
বস্তুর ব্যবসা করে হোক অথবা সমকামী, ব্যভিচার, গান-বাদ্য, অভিনয়, যাদু ও গণক বিদ্যা চর্চা করে। জাতীয় বা কারোর ব্যক্তিগত সম্পদ লুট করেই হোক অথবা কাউকে বিপদে ফেলে। শরীয়তে এ জাতীয় দর্শনের কোন স্থান নেই। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

»وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْـحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْن«َ

''তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধনসম্পদ অন্যায়রূপে গ্রাস করো না এবং তা ঘুষরূপে বিচারকদেরকেও দিও না জেনেশুনে মানুষের কিছু ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করার জন্য''। (বাক্বারাহ্ : ১৮৮)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

«ْيَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ»

''হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধনসম্পদ অন্যায়রূপে গ্রাস করো না। তবে যদি তা পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসায়ের ভিত্তিতে হয়ে থাকে তা হলে তাতে কোন অসুবিধে নেই''। (নিসা' : ২৯)

হারামখোরের দো'আ আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কবুল করেন না।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

ثُمَّ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْـحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.!?

''অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে দীর্ঘ সফর করে ক্লান্ত, মাথার চুল যার এলোমেলো ধূলেধূসরিত সে নিজ উভয় হাত আকাশের দিকে সম্প্রসারিত করে বলছে, হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম তথা তার পুরো জীবনোপকরণই হারামের উপর নির্ভরশীল। অতএব তার দো'আ

কিভাবে কবুল হতে পারে?!'' (মুসলিম ১০১৫)উক্ত হাদীস থেকে হারাম ভক্ষণের ভয়াবহতা সুস্পষ্টরূপে বুঝে আসে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফিরের দো'আ ফেরত দেন না অথচ এখানে তার দো'আ কবুলই করা হচ্ছে না। আর তা এ কারণেই যে, তার জীবন পুরোটাই হারামের উপর নির্ভরশীল।হারামখোর পরকালে একমাত্র জাহান্নামেরই উপযুক্ত। জান্নাতের নয়।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

كُلُّ لَـحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ.

''যে শরীর হারাম দিয়ে গড়া তা একমাত্র জাহান্নামেরই উপযুক্ত''।

(ত্বাবারানী/কবীর ১৯/১৩৬ সা’হীহুল্ জামি’, হাদীস ৪৪৯৫)
উপরোক্ত হাদীস গুলো থেকে বুঝা যায় হারাম ভক্ষণ আমলের উপর ঠিক কেমন
প্রভাব ফেলে।যে ব্যক্তির রিযিক হারাম সে কখনোই ইলম অর্জন করতে পারে না।আর যদি ইলম শিখেও ফেলে এবং তা প্রচার করে তবে তা হবে তার জাতির
জন্য ফিতনার কারণ।

১৩)সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তি:

সোশ্যাল মিডিয়ার পেছনে বেশি সময় অপচয় করা ও নেশার মতো পেছনে লেগে
থাকা উচিত নয়, যে কারণে ইবাদত-বন্দেগিতে অলসতা সৃষ্টি হয়, বাবা-মা, ভাই-বোন ইত্যাদি রক্ত সম্পর্কীয় বন্ধন ও নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয়, নামাজ, কোরআন তেলাওয়াত, জিকির-আজকার, ইসলামি জ্ঞানচর্চা এবং নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন করা হয়।গুরুত্বপূর্ণ কিংবা উপকারী নয় এমন বিষয় পোস্ট করা ইসলামের দৃষ্টিতে অনর্থক কাজ। এর মাধ্যমে সময়, শ্রম, অর্থ ও মেধার অপচয় হয়। ইসলামের সৌন্দর্য হলো অযথা ও
অনর্থক যাবতীয় কার্যক্রম থেকে দূরে থাকা।এ কথা অনস্বীকার্য যে, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম ও ইউটিউবসহ নানা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বর্তমান সময়ে আধুনিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিরাট একটা অংশ দখল করে নিয়েছে। এর দ্বারা যেমন মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপকৃত হচ্ছে, তেমনি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অনেক সময় এগুলোর মাধ্যমে মানসিক
অস্থিরতা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, দাম্পত্য কলহ, ধর্মীয় বাদানুবাদ, রাজনৈতিক সহিংসতা, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা এবং আইনবিরোধী ও বিভিন্ন অপরাধমূলক

কার্যক্রম বাড়ছে। হাদিসে এসেছে, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন, হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করা ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্যময় দিক।' জামে তিরমিজি
তিনি আরও বলনে, 'যে কাজে তোমার উপকার আছে তার প্রতি আগ্রহী হও।' মিশকাত : ৫২৯৮
ইসলামে অর্থ-সম্পদ, যৌবন ও সময়কে উপকারী কাজে লাগানো এবং অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিস আসার আগে গনিমতের অমূল্য সম্পদ মনে করো ১. যৌবনকে বার্ধক্য আসার আগে। ২. সুস্থতাকে অসুস্থ হওয়ার আগে। ৩. সচ্ছলতাকে দরিদ্রতা আসার আগে। ৪. অবসর সময়কে ব্যস্ততা আসার আগে এবং ৫. জীবনকে মৃত্যু আসার আগে।' (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা)

১৪)দোয়ার ঘাটতি

:হজরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) ইরশাদ করেন, 'দোয়া মুমিনের হাতিয়ার, দ্বিনের খুঁটি এবং আসমান ও জমিনের আলো। 'দোয়া হলো আল্লাহ ও তার বান্দা মধ্যে সেতুবন্ধন।দোয়ার গুরুত্ব এতোটাই বেশি যে, হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আল্লাহর কাছে নিজ প্রয়োজন পূরণের জন্য দোয়া করে। এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। -তিরমিজি।তাই আমরা যখন দুয়া করা ছেড়ে দেয় সব ধরনের নিয়ামত থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে পড়ি।আর হিদায়াত হলো এমন একটি নূর যার উপর টিকে থাকতে হলে অবশ্যই দুয়া ও শুকরিয়া আদায় করে যেতে হবে।যে বান্দা দুয়া করা ছেড়ে দেবে সে ধীরে ধীরে আমল,ইখলাস তথাপি হিদায়াত থেকে দূরে সরে যাবে।তাই তো,হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) ইরশাদ করেন, যে আল্লাহর নিকট কিছু চায় না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার ওপর রাগ করেন। -তিরমিজি

১৫)অশ্লীলতা:

আল কোরআনের আলোকে অশ্লীলতা হচ্ছে, অন্যের মন্দ কথা প্রকাশ করা, অনর্থক বিষয়ে কথা বলা, এমন অপবাদ ছড়ানো যে বিষয়ে নিজেদের জ্ঞান নেই, চারজন লোকের চাক্ষুষ সাক্ষী ব্যাতিত জেনার অপবাদ দেয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ইত্যাদি।

ফাহিশাতুন শব্দটির মূল ফাহিশুন যার অর্থ অশ্লীল কাজ। এই অশ্লীলতা নিয়ে পবিত্র কোরআনুল হাকিমে ২৪ টি আয়াত রয়েছে। অশ্লীলতাকে আল্লাহতায়ালা হারাম করেছেন।অশ্লীলতার ফলে ইমান দূর্বল হয়ে পড়ে। ফলে আমলে অনীহা চলে আসে।যে অন্তরে গুনাহ ঢুকে যায় সেখানে আর হিদায়াতের নূর অবশিষ্ট থাকে না।যে কান দিয়ে গান শুনা হয় সেই কান আর কুরআনের মাধুর্যতা উপলব্ধি করতে পারে না।যে চোখ হারাম কিছুতে আনন্দ পায় সে চোখ আর ইবাদতে স্বাদ পায় না।

আল্লাহ বলেন, হে মুহাম্মদ (স.) বলুন- "আমার রব হারাম করেছেন যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অসংগত বিরোধিতা, আল্লাহর সাথে এমন কিছু শরীক করা যার কোন প্রমাণ তিনি নাযিল করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না."

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রয়েছে আরো ২৩ টি আয়াত। শয়তান মানুষকে অশ্লীল কাজের প্ররোচনা দেয়- আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র বস্তু আছে তা থেকে তোমরা আহার কর আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না।সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো তোমাদের নির্দেশ দেয় মন্দ ও অশ্লীল কাজ করতে এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন সব বিষয় বলতে বলে যা তোমরা জান না।"

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "শয়তান তোমাদের অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার হুকুম দেয়। আর আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন তার ক্ষমার এবং অনুগ্রহের। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"

ব্যভিচার নিঃসন্দেহে অশ্লীলতা। আল্লাহ বলেন, “তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না। অবশ্যই এটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পন্থা।”এ থেকে বোঝা যায়,অশ্লীলতা আমলের ক্ষেত্রে কতটা ভয়াবহ প্রভাব ফেলে।

১৬)অহংকার:

অহংকার হলো পতনের মূল।প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুটি শক্তি লুকায়িত থাকে। একটি ফেরেশতার চরিত্র বা ইতিবাচক গুণাবলি আর দ্বিতীয়টি হলো শয়তানি চরিত্র বা মন্দ স্বভাব। নেতিবাচক স্বভাবের একটি হলো অহংকার।অহংকার শয়তানের চরিত্র। এই অহংকার ও হিংসাই ইবলিশকে ফেরেশতাদের শিক্ষক থেকে শয়তানে পরিণত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘সে ইবলিশ সম্মানিত আদমকে সিজদার মাধ্যমে সম্মান করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল, পরিণতিতে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।’ (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ৩৪)।আত্মগৌরব করা শুধু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি এ গুণ নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে টানাটানি করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন; তার প্রভাব, প্রতাপ, প্রতিপত্তি নস্যাৎ করে দেন এবং তার জীবনকে সংকুচিত করে দেন। হাদিস কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘অহংকার আমার সম্মানের উত্তরীয় আর সম্মান হচ্ছে আমার গৌরবের পোশাক; যে ব্যক্তি এ দুটির কোনো একটি নিয়ে আমার সঙ্গে টানাটানি করে, আমি তাকে আজাবে নিক্ষেপ করি।’ (আবু দাউদ: ৪০৯০)। দুনিয়াতে অহংকারের পরিণতি হলো লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। যার অন্তরে যতটুকু অহংকার সৃষ্টি হবে, তার জ্ঞান ততটুকু হ্রাস পাবে। যদি কারও অন্তরে অহংকার স্থিতি লাভ করে, তবে তার জ্ঞানচক্ষু অন্ধ হয়ে যায়, বোধশক্তি লোপ পায়; সে অন্যের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। তার চেহারায়, আচরণে, চলনবলনে ও কাজকর্মে অহংকারের দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। (বুখারি, মুসলিম, মিশকাত: ৪০২৯)।আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই নৈকট্যশীল ফেরেশতারা যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে থাকে, তারা তাঁর ইবাদতে অহংকার করে না। তারা তাঁর গুণগান করে ও তাঁর জন্য সিজদা করে।’ (সুরা : আরাফ, আয়াত : ২০)।ইবাদতের মধ্যে অহংকার ও লৌকিকতা থাকলে তার ফল পাওয়া যায় না।কর্মে অহংকারী হলো লোক-দেখানো ইবাদতকারীরা। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই

মুনাফিকরা আল্লাহর সঙ্গে প্রতারণা করে। আর তিনিও তাদের ধোঁকায় নিক্ষেপ করেন। যখন তারা সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়। তারা লোকদের দেখায় এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। এরা দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে। না এদিকে, না ওদিকে। বস্তুত আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্য কোনো পথ পাবে না।'(সুরা : নিসা, আয়াত : ১৪২-১৪৩)

এসব মানুষের নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত সব কিছু বৃথা হবে। আল্লাহ বলেন, 'আর আমি সেদিন তাদের কৃতকর্মসমূহের দিকে মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলো বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।'

(সুরা : ফুরকান, আয়াত : ২৩)

আমলে অধঃপতনের প্রভাব

১)ব্যক্তি জীবনে:

আমলে অনীহা একজন ব্যক্তির জীবনে যে প্রভাব ফেলতে পারে তা হলো:

আল্লাহর অসন্তুষ্টি :

আমাদের জীবন মরণ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে।জীবন নামের এই কিছু সময়ের সমষ্টি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে জান্নাত লাভের উপকরণ মাত্র। জীবন ত্যাগের জন্য নির্ধারিত, সুখের জন্য নয়। তাই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি।কিন্তু কিছু কারণে আল্লাহ আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হন।তার মধ্যে অন্যতম হলো আমলে উদাসীনতা।

নির্দয় হওয়া :

আমলের অনীহার ফলে ব্যক্তির অন্তর কঠোর হয়ে যায় ও মানুষের প্রতি নির্দয় হয়ে যায়।

আপনজনের সঙ্গে মন্দ আচরণ করে। আর আল্লাহ যখন কোনো বান্দার ওপর রাগান্বিত হন, তখন তার দিল থেকে দয়া উঠিয়ে নেন। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, হে আয়েশা, তুমি কখন আমাকে অশালীন দেখেছ?

কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে মর্যাদার দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যার অনিষ্টের কারণে মানুষ তাকে ত্যাগ করে। ’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬০৩২)

বরকত উঠিয়ে নেওয়া :

আল্লাহ তাআলা যখন কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হন তখন তার জীবন থেকে বরকত উঠিয়ে নেন এবং তার ওপর বিভিন্ন ধরনের শত্রু নিয়োজিত করে দেন। আল্লাহ বলেন, ‘আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূ-গর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করার ছিলেন না; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। ’ (সুরা আনকাবুত, আয়াত : ৪০)

বালা মুসিবত লেগে থাকা

: আল্লাহ যখন বান্দার উপর অসন্তুষ্ট হয় তখন তার উপর বালা মুসিবত ঢেলে দেন।তবে এ মুসিবত অনেক সময় বান্দার পরিবর্তনের কারণ ও হয়। তাই আনাস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, বিপদ যত মারাত্মক হবে, প্রতিদানও তত মহান হবে। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন তখন তাদের (বিপদে ফেলে) পরীক্ষা করেন। যে লোক তাতে (বিপদে) সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য (আল্লাহ তাআলার) সন্তুষ্টি বিদ্যমান। আর যে ব্যক্তি তাতে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য (আল্লাহ তাআলার) অসন্তুষ্টি বিদ্যমান। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৩৯৬)

দোয়ার বরকত উঠে যাওয়া :

আমলের অনীহার ফলে বান্দা দোয়া করতে চায় না।অথচ আল্লাহ তাআলা চান তাঁর বান্দা তাঁর কাছে প্রার্থনা করুক। আল্লাহ বলেন, ‘আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকারবশে আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। ’ (সুরা গাফির, আয়াত : ৬০)।আবু হুরায়রা (রা.) বলেন,

রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলার কাছে যে ব্যক্তি প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হন। ' (তিরমিজি, হাদিস : ৩৩৭৩)

সত্যকে গোপন করা : আমলের অনীহার ফলে নিজের হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে সত্য মিথ্যার পার্থক্য ভূলে যায়।ফলে অন্যকে ছোট করার মানসিকতা, মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধিলাভ করার প্রচণ্ড আকাঙ্খা জন্মায়। যার ফলে সে ভালো কাজ করে লোক দেখানো ও খ্যাতি লাভের জন্য। তার চাওয়া-পাওয়া একমাত্র তার প্রবৃত্তিকে পূরণ করা। তার প্রবৃত্তি তার প্রভু হয়ে যায়। পরকাল থেকে সম্পূর্ণ থাকে সে উদাসীন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয়ে অবগত। নিশ্চয়ই তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না। ' (সুরা নাহল, আয়াত : ২৩)

নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া

: প্রতিটি বান্দার ওপর দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা আল্লাহ তাআলার হাজারো নিয়ামত বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু যারা অকৃতজ্ঞ তারা আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত পেয়েও তা অস্বীকার করে। আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা অস্বীকার করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের থেকে বেপরওয়া। তিনি তাঁর বান্দাদের কাফির হয়ে পড়া পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। ' (সুরা জুমার, আয়াত : ৭)

২)পারিবারিক জীবনে:আমলে অনীহা পারিবারিক জীবনে যে প্রভাব ফেলতে পারে তা হলো :

পারিবারিক কলহ ও অশান্তি:

কোনো পরিবারে নিয়মিত সালাত আদায় হয় ও আল্লাহর যিকির করা হয়,অপরদিকে অন্য একটি পরিবার আমলশূণ্য।এক্ষেত্রে ২টি পরিবার কিন্তু এক নয়।যে পরিবারটিতে আমল নিয়মিত করা হয় সেখানে আল্লাহর রহমত ও বজায় থাকে।সেই মানুষগুলো একে অন্যের জন্য হয়ে উঠে চক্ষু শীতলকারী।অপরদিকে যে পরিবারটি আমলশূণ্য সেখানে আল্লাহর লানত পড়তে থাকে ফলে সেই পরিবারের মানুষগুলোর মধ্যে অশান্তি বজায় থাকে।তারা কোনো কিছুতে সুখ খুজে পায় না।এছাড়া পরিবারের মানুষদের মধ্যে আমল বা ইলম সম্পর্কে জানা না

থাকলে তারা একে অন্যের হক আদায় করতে পারে না। তা হোক স্বামী-স্ত্রী কিংবা বাবা,মা-সন্তানের সম্পর্ক। ফলে সম্পর্কে ফাটল কিংবা মনোমালিন্য দেখা দেয়।এবং পরিবারে এসব অশান্তি লেগেই থাকে।পরিবারকে ইসলামী অনুশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত করতে পারলে সামাজিক অস্থিরতা ও সব ধরনের কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখা সম্ভব। এতে সমাজ ও রাষ্ট্র দুটোই উপকৃত হবে। মৃত্যুর পর মানুষকে আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে সে আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করেছে কি না?কারণ একজন মুমিন বান্দার বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। আর এ সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে পারিবারিক জীবনে ইসলামের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে।

রহমত উঠে যাওয়া:

পৃথিবীতে আল্লাহর রহমত ছাড়া কারো পক্ষেই টিকে থাকা সম্ভব নয়। প্রতি মুহূর্তেই আল্লাহর রহমত বর্ষণ হতে থাকে। তবে যারা আল্লাহর অবাধ্য ও পাপে লিপ্ত তারা এ রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে। একইসাথে কিছু কিছু কারণে কারো কারো জীবনে বিদ্যমান রহমতও উঠে যায়।সাহাবি আবু দারদা (রা.) বলেন,'রাসুল সা. আমাকে অসিয়ত করেছেন যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না। তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হলেও এবং তোমাকে জ্বালিয়ে ফেলা সত্ত্বেও। আর ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামাজ পরিহার কোরো না। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামাজ ছেড়ে দিলে তার ওপর থেকে আল্লাহ তায়ালার দায়িত্ব উঠে যায়' (ইবনে মাজা : ৪০৩৪)।সুতরাং একটি পরিবারের সবাই যখন সালাত ত্যাগ করে কিংবা আমল ছেড়ে দেয় তখন তাদের উপর থেকে আল্লাহর সকল জিম্মাদারি উঠে যায় ও শয়তান তাদের উপর ভর করে বসে।

ধর্মীয় পরিবেশের অবক্ষয়

:একটি পরিবারে যখন সকলে আমল থেকে দূরে চলে যায় সেই পরিবারের সন্তানরা আর আমলে ছায়ায় বেড়ে উঠতে পারে না।তারা বুঝতে পারেনা কারোও হক সম্পর্কে।কিংবা ভালো খারাপ সম্পর্কে। একটা সময় ছিল যখন বাচ্চারা তাদের দাদা-দাদী, নানা-নানী বা চাচা-মামাদের কাছে যেত।নানা রকম গল্প শোনত, আদর্শ গঠনের নানা উপদেশ তাদের কাছ থেকে পেত। কিন্তু বর্তমানে

বাচ্চারা সেই ধরনের কোনো পরিবেশ পায় না।ফলে তারা পারিবারিক মমত্ববোধ ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কী জিনিস সেটা জানতে পারে না। নৈতিক চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে হলো- ধর্মীয় মূল্যবোধ।সেটা থেকেও তারা বঞ্চিত থাকে।ফলে এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম তারা আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরতে থাকে।

৩)সামাজিক জীবনে:আমলে অনীহা সামাজিক জীবনে যে প্রভাব ফেলতে পারে তা হলো:

নৈতিকতা ধ্বংস :বর্তমানে নীতি-নৈতিকতা ও সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে এবং এসব বিষয়ে নানা আলোচনা চলছে বিভিন্ন মহলে। নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের মাঝে বর্তমানে নৈতিকতার চরম অবক্ষয় লক্ষ করা যাচ্ছে। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।নৈতিক মূল্যবোধহীনতা যাদের মাঝে বিদ্যমান, তারা নানাবিধ মন্দ কাজে জড়িয়ে যাচ্ছে। এ জন্য পারিবারিক শিক্ষার ঘাটতি রয়েছে বলে সমাজ সচেতনরা মনে করছেন।একনিষ্ঠ আল্লাহর ইবাদাতই পারে সমাজকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে বাঁচাতে আমলের মধ্যেই জীবনাচারণের সব আদর্শিক বিষয়গুলো উল্লেখ আছে। আর সেই আমলের মধ্যেই জীবনের উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব।আমল ও ইলমের মাধ্যমে ভুল এবং সঠিক বিষয়টি জানা যায়। ধর্মীয় বিধিবিধানে এসবের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে মানুষ বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্ম অনেক দূরে। সমাজে আমল করার প্রবণতা কম, ফলে ন্যায়বোধ সমাজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।যারা ন্যায়বোধকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, তাদের দ্বারা সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়; হতে পারে না। মানুষকে নিয়ন্ত্রণের জন্যে ইলম শিক্ষার মধ্যে যে ন্যায়বোধের কথা বলা হয়েছে, সেটিই কিন্তু সবচেয়ে বড় শক্তি। অর্থাৎ ধর্মচর্চা যদি দুর্বল হয়, তাহলে সেই ন্যায়বোধও দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন সেটা সমাজে কিংবা ব্যক্তিজীবনে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

গুনাহের মাত্রা বেড়ে যাওয়া:সমাজের মানুষের মধ্যে আমল কমে গেলে গুনাহ বেড়ে যায়।বর্তমানে আমরা দেখতে পাই হারাম কাজ,সুদ,ঘুষ,যিনা ইত্যাদি গুনাহের পরিমান ভয়ংকর ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে

গণমাধ্যমের খবরের প্রায় অর্ধেকই সামাজিক অবক্ষয়ের খবর।স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন, স্ত্রীর হাতে স্বামী খুন, প্রেমিকার হাতে প্রেমিক খুন, প্রেমিকের হাতে প্রেমিকা খুন, ভাইয়ের হাতে ভাই খুন, ছেলের হাতে মা খুন, দুলা ভাইয়ের হাতে শালি খুন, পুত্রের হাতে পিতা খুন ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার খুন, ধর্ষণ, গুমের খবরও কম নয়।বিশেষ করে শিশু ধর্ষণের খবর দেশের সর্বত্রই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।এছাড়াও সুদ ব্যপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুদের দরুন আল্লাহর আজাব গ্রাস করে।হজরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, 'যাদের মাঝে ব্যভিচার ও সুদ বিস্তার লাভ করল, তারা নিজেদের ওপর আল্লাহর আজাব নামিয়ে নিল।' (মুসনাদে আহমদ : ৩৮০৯)।এসব জঘন্য গুনাহের মূল কারণ তাকওয়ার অভাব।

যা ইলম ও আমল হতে দূরে চলে যাওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়।

জালেম শাসক:আল্লাহর অবাধ্য হলে জালেম শাসক চেপে বসে। হজরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, হাদিসে কুদসিতে রয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি সব সৃষ্টির উপাস্য, আমাকে ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আমি রাজন্যবর্গের অধিপতি। সম্রাটদের সম্রাট। রাজাদের অন্তর আমার নিয়ন্ত্রণাধীন। বান্দাগণ যখন আমার আনুগত্য করে, তখন তাদের রাজা-বাদশাহদের অন্তরকে রহমত ও করুণার সমন্বয়ে তাদের দিকে ঘুরিয়ে দিই। আর যখন বান্দারা আমার অবাধ্যতা অবলম্বন করে, তখন রাজা-বাদশাহদের অন্তরকে রাগ ও কঠোরতার দিকে ঝুঁকিয়ে দিই, যার ফলে তারা প্রজাদেরকে কঠিন নিপীড়ন আস্বাদন করায়।' (হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/১৮০)। মানুষের ওপর জালেম ও অত্যাচারী শাসক চাপিয়ে দেওয়া হয় মানুষের অপকর্মের কারণে।আর মানুষ অপকর্ম করে যখন সে ইলম ও আমল থেকে দূরে চলে যায়।

অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়া:বর্তমানে অশ্লীলতা, নগ্নতা, জিনা, ব্যভিচার জঘন্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে এই মারাত্মক ব্যাধি।এই জিনা বেড়ে গেলেও আল্লাহর রহমত উঠে যায়। জিনা-ব্যভিচারের কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।হজরত আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে

শুনেছি, যে জাতির মাঝে ব্যভিচার বিস্তার লাভ করে, তাদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে পাকড়াও করা হয়' (মুসনাদে আহমদ : ১৭৮১২)।মানুষ এই গুনাহে লিপ্ত হয় যখন সে এ ব্যাপারে উদাসীন থাকে।

ফরয আমল পরিত্যাগের শাস্তি

ফরজ ইবাদত অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। ফলে তার গুরুত্ব অত্যধিক। ফরজ ইবাদত ছেড়ে দেওয়া কোনো অবস্থায়ই জায়েজ নেই। কোনো মুমিন বিনা কারণে ফরজ ইবাদত ছেড়ে দিলে তাকে চরম শাস্তি পেতে হবে।

১)ফরজ নামাজ তরক করার শাস্তি :

নামাজ ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ শারীরিক ইবাদত। তা বর্জনের শাস্তি দুই ধরনের—ক. ইহলৌকিক শাস্তি ও খ. পারলৌকিক শাস্তি।

ক)ইহলৌকিক শাস্তি : নামাজ বর্জনকারী আল্লাহর নিয়ামত, বরকত ও রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। সালাত আদায়কারী মুসলিম নারীর সাথে বেনামাযীর বিয়ে দেওয়া নাজায়েয। তার অভিভাবকত্ব বিলুপ্ত, তার জবাহকৃত মাংস খাওয়া নাজায়েয, সে তার কোনো আত্মীয়ের সম্পত্তির অংশ পাবে না। তেমনি তার আত্মীয়গণও তার থেকে কোনো অংশের অধিকারী হবে না, মারা গেলে তার জানাযা আদায় করা যাবে না, তার ক্ষমা ও করুণার জন্য দো'আ করা যাবে না, মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা হবে না এবং সে দীনী ভাই হিসেবে গণ্য হবে না, বরং তার থেকে বিমুখ হওয়া ও তার সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিন্ন করা ওয়াজিব।আল্লাহর ফেরেশতারা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তার দোয়া কবুল হয় না, তার চেহারার নুর উঠে যায়, তার জীবিকা সংকীর্ণ করা হয়।ফলে সে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কষ্ট পায়। তাই শিশুদের ১০ বছর বয়স থেকেই নামাজের গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এই বয়সে নামাজ ছেড়ে দিলে মা-বাবাকে তাকে শাস্তি দিতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে নামাজের আদেশ করো।আর ১০ হলে নামাজ ছাড়ার জন্য শাস্তি প্রদান করো। শরীয়া আইন অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরা এবং ইসলামী সরকারপ্রধান নামাজ বর্জনের জন্য শাস্তি প্রয়োগ করতে পারেন। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম

মুজানির (রহ.)-এর মতে, কোনো ব্যক্তি অলসতাবশত ইচ্ছাকৃত নামাজ ছেড়ে দিলে তাকে আটক করা হবে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ও কোনো কোনো শাফেয়ি আইনবিদের মতে, নামাজ বর্জনকারীকে হত্যা করা হবে। কেননা রাসুল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামাজ বর্জন করল, সে কুফরি করল (সহিহ মুসলিম : ১/১২৪) হানাফি ইমামরা বলেন, আল্লাহ তাআলা তাওহিদে বিশ্বাসী পাপীকেও মুমিন বলে সম্বোধন করেছেন।আর নামাজ নেক আমলের অন্যতম। যে ব্যক্তি তা বর্জন করল সে পাপী-ফাসেক হলো। ফলে নামাজ বর্জনকারীকে জেলখানায় আটক রাখা হবে, যতক্ষণ না নামাজ পড়ার স্বীকৃতি দান করে (বাহরে রায়েক : ৫/৪৯; আল-বাদায়ে ওয়াস সানায়ে : ৭/৬৪; নাইলুল আওতার : ১/৩৪৮০)

খ)পারলৌকিক শাস্তি : নামাজ ছেড়ে দেওয়া মারাত্মক গুনাহ।বেনামাযীকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে, যেমন সহীহ বুখারীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্বপ্নের বর্ণনায় রয়েছে: “তিনি চিৎ অবস্থায় শায়িত এক ব্যক্তির নিকট আসলেন, এমতাবস্থায় একটি পাথর হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্য একজন, অতঃপর সে উক্ত পাথর দিয়ে তার (শায়িত ব্যক্তির) মাথায় আঘাত করছে, যার ফলে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, পাথরটি ছিটকে দূরে চলে যাচ্ছে, পুনরায় সে দৌড়ে গিয়ে পাথরটি নিয়ে ফিরা মাত্র উক্ত ব্যক্তির মাথা পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় ঐ ব্যক্তি আপন স্থানে ফিরে তাকে ঐ ভাবেই (শাস্তি) দিচ্ছে যেভাবে প্রথমবার দিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন তখন দুই ফিরিশতা তাঁকে অবহিত করেন যে, এতো ঐ ব্যক্তি যে কুরআন পড়ত, কিন্তু তার প্রতি আমল করত না এবং ফরয সালাত ছেড়ে ঘুমাত।হাদিস শরিফে নামাজ বর্জনকারীর প্রতি কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘বান্দা ও কুফরির মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ বর্জন করা।’ (তিরমিজি, মিশকাত, পৃষ্ঠা ৩৩২) তিনি আরো বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে না, দ্বীন ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।’ (তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, মিশকাত, পৃষ্ঠা ৪৫২)। বেনামাজি কিয়ামতের দিন চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

'স্মরণ করো সেই চরম সংকটের দিনের কথা, যেদিন তাদেরকে আহ্বান করা হবে সিজদা করার জন্য, কিন্তু তারা করতে সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল তখন তো তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিল (সুরা : কালাম, আয়াত : ৪২, ৪৩)। নামাজ বর্জনকারী জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।কুরআনে এসেছে, অপরাধীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলবেন, 'তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? তারা বলবে, আমরা নামাজ পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না, আমরা সমালোচকদের সঙ্গে সমালোচনা করতাম এবং প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম। (সুরা : মুদ্দাসসির, আয়াত : ৪১-৪৬)

২) রোজা বর্জন করার শাস্তি

: রোজা অন্যতম ফরজ ইবাদত। যে মুমিন ব্যক্তি রোজা বর্জন করল সে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করল। কারণ সে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অমান্য করেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৮৩) আরো ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোজার মাসে উপস্থিত থাকে, সে যেন রোজা রাখে (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৮৫) অতএব, রোজা বর্জনকারীর জন্য রয়েছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তি।

ক)ইহলৌকিক শাস্তি:যে ব্যক্তি সফর, ঋতুস্রাব, রোগব্যাধি, দুগ্ধপান ও প্রসূতি হওয়ার কারণে রোজা ছেড়ে দিল তার ওপর রোজা কাজা করা আবশ্যক। আর যে ব্যক্তি বার্ধক্যজনিত কারণে রোজা ছেড়ে দিল, তার ওপর ফিদিয়া দেওয়া আবশ্যক। ভুলবশত রোজার মাসে দিনে পানাহার করলে রোজা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু ইচ্ছাকৃত পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম করলে কাজা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। কাফফারা হলো একাধারে দুই মাস রোজা রাখা কিংবা একজন ক্রীতদাস মুক্ত করা অথবা ৬০ জন মিসকিনকে খাদ্য দান করা। দুররুল মুখতার গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে রমজানের রোজা না রাখলে রাষ্ট্রীয় শাস্তি হিসেবে তাজির (লঘু শাস্তি) প্রদান করতে হবে এবং আটক রাখতে হবে। হানাফি আইনবিদদের মতে, যে ব্যক্তি রোজার কাজা কাফফারা আদায় করবে না, তাকে ইসলামী রাষ্ট্রে

আটক করা হবে এবং তাজিরি শাস্তি প্রদান করা হবে। যতক্ষণ না তাওবা করে ফিরে আসে। আর যদি তাওবা না করে, তাহলে তাকে বন্দি করে রাখা হবে (আল-বাদায়ে ওয়াস সানায়ে : ৭/৬৩-৬৪)

খ)পারলৌকিক শাস্তি:রোজা অস্বীকারকারী কাফির বলে গণ্য হবে (বায়হাকি, মিশকাত, পৃষ্ঠা ১৯৯)। অলসতাবশত, ইচ্ছাকৃত রোজা বর্জন করলে কবিরা গুনাহকারী হিসেবে গণ্য হবে। তাওবা ছাড়া তার এই গুনাহ মাফ হবে না। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বিনা কারণে ইচ্ছাপূর্বক রমজানের একটি রোজা ছেড়ে দেবে, অন্য সময়ে সারা জীবনের রোজা তার সমকক্ষ হবে না (তিরমিজি)। কেউ রোজার প্রতি উপহাস বা বিদ্রুপমূলক আচরণ করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। (বুখারি, মিশকাত, পৃষ্ঠা ১৯৯)

৩)যাকাত না দেওয়ার শাস্তি

: বিবেকবান, বয়ঃপ্রাপ্ত, মুসলিম নিসাবের মালিকের ওপর বছরান্তে যাকাত আদায় করা ফরজ। যে ব্যক্তি এই ফরজ পরিত্যাগ করবে, সে ইহকাল ও পরকালে শাস্তির যোগ্য হবে। যে ব্যক্তি যাকাত ফরজ হওয়ার পর ও তা অস্বীকার করবে, তার শাস্তি হবে অন্যান্য ইবাদত ত্যাগকারীর মতো। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত অলসতাবশত যাকাত পরিহার করবে, তার জন্য রয়েছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কঠোর শাস্তি। জাকাত প্রদান না করলে রহমতের বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কোরআন মাজিদে যাকাত বর্জনকারীর জন্য জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ও গলদেশে বিষধর সাপ হার হয়ে দংশনের কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে।এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা পবিত্র কুরআনে বলেন:

وَاَنۡفِقُوۡا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَلَا تُلۡقُوۡا بِاَيۡدِيۡكُمۡ اِلَى التَّهۡلُكَةِ ۛۚ وَاَحۡسِنُوۡا ۛۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُحۡسِنِيۡنَ

আর আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় কর এবং নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না এবং সৎকর্ম অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।(আল বাকারা - ১৯৫)।এছাড়াও তিনি বলেন:

وَلَا يَحۡسَبَنَّ الَّذِيۡنَ يَبۡخَلُوۡنَ بِمَاۤ اٰتٰٮهُمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ هُوَ خَيۡرًا لَّهُمۡ‌ؕ بَلۡ هُوَ شَرٌّ لَّهُمۡ‌ؕ سَيُطَوَّقُوۡنَ مَا بَخِلُوۡا بِهٖ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ‌ؕ وَلِلّٰهِ مِيۡرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ‌ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ

আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহে (সম্পদে) যারা কৃপণতা করে, তারা যেন কিছুতেই মনে না করে, এটা তাদের জন্য ভালো কিছু। বরং এটা তাদের পক্ষে অতি মন্দ। যে সম্পদের ভেতর তারা কৃপণতা করে, কিয়ামতের দিন তাকে তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে দেওয়া হবে। ৭৯ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর মীরাছ কেবল আল্লাহরই জন্য। তোমরা যা-কিছুই কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।(আলে ইমরান - ১৮০)।যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত অলসতাবশত যাকাত দেওয়া বর্জন করবে, তার শাস্তির ব্যাপারে ইসলামী আইনবিদদের মতামত হলো:ক. হানাফি ইমামদের মতে, তাকে আটক রেখে তাজিরি দিতে হবে, যাতে সে যাকাত আদায় করে দেয়। খ. হাম্বলি ও শাফেয়ি ইমামদের মতে, ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে যদি কোনো মুসলমান যাকাতের ফরজকে স্বীকৃতি দিয়ে আদায় করতে বিরত থাকে, তাহলে তার প্রতি বল প্রয়োগ করা হবে, যাতে সে স্বেচ্ছায় যাকাত প্রদান করতে বাধ্য হয়। আর যদি সে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য করা থেকে বের হয়ে যায় এবং যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। যেমন—হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন। (বুখারি : ১/১০ জাকাত পর্ব, সহিহ মুসলিম : ১/৩২)।বর্তমানে ইসলামী আইনবিদদের মতে, পূর্ববর্তী বিধান রহিত হয়ে তাজিরি (লঘু) শাস্তি নির্দিষ্ট হয়েছে। আর তা হলো আটক রাখা। (আকিদাতুল ইসলাম, ইমাম মাতুরিদী, পৃষ্ঠা ৪৪৮-৪৫৯)

৪)হজ না করার শাস্তি

: হজ ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। বয়ঃপ্রাপ্ত, বিবেকবান, সুস্থ, স্বাধীন, মুসলিম সামর্থ্যবান নর-নারীর ওপর জীবনে একবার হজ করা ফরজ। যে ব্যক্তি হজ ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করবে এবং হজকে তুচ্ছজ্ঞান করবে, তার শাস্তি হবে অন্যান্য ইবাদত বর্জনকারীর মতো। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত অলসতাবশত হজ বর্জন করবে, সে পাপী হবে। পরকালে তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তিকে কোনো প্রকাশ্য প্রয়োজন বা অত্যাচারী শাসক কিংবা আবদ্ধকারী অসুস্থতা বাধা দেয়নি, কিন্তু সে হজ না করে মারা গেল, সে ইহুদি বা খ্রিস্টান হয়ে মারা যাক তার ব্যাপারে আমার কোনো দায়িত্ব নেই।

(মুসলিম : ১/১১, হজ পর্ব) আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘যেসব ব্যক্তি হজে যাওয়ার রাস্তার সামর্থ্য রাখে, সেসব ব্যক্তির ওপর আল্লাহর উদ্দেশে বায়তুল্লাহর হজ করা ফরজ। যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা জগৎসমূহ থেকে অমুখাপেক্ষী। (সুরা : আলে-ইমরান, আয়াত : ৯৭) আহলে জাওজাহির সম্প্রদায় বলে, ইচ্ছাকৃত হজ বর্জনকারীকে তাজিরি (লঘু) শাস্তি প্রদান করা হবে। বেশির ভাগ ইসলামী আইনবিদের মতে, হজ বর্জনকারীকে তাজিরি শাস্তি বা আটকাদেশ কোনোটাই করা যাবে না। কারণ হজ জীবনে একবারই ফরজ, তাকে তা আদায়ের জন্য সুযোগ দেওয়া হয়েছে অথবা মৃত্যুর পর বদলি হজ করানোরও সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে তা আদায়ের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। অনাদায়ের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে। (আল-বাদায়ে ওয়াস সানায়ে : ২/১০৭৮, মাবসুত সারাখস : ৪/২-৪

আমলী অধঃপতনে আমাদের যা করণীয়

১)গুনাহ চিন্হিতকরণ ও ত্যাগ করা:

মানুষকে আল্লাহ তাআলা ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। কখনও কখনও মানুষ মন্দ কাজ করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। কিন্তু গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকতে না পারলে পরকালীন সফলতা ধ্বংস হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا অর্থ: ‘যে নিজের আত্মাকে (পাপ-পঙ্কিলতা থেকে) পবিত্র করে সেই সফল হয় আর যে তাকে কলুষিত করে (সে) ধ্বংস হয়।’ (সুরা শামস: ১০)।মন্দ কাজ করার ইচ্ছাকে দমন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন একজন মুমিন। কেননা প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে থাকলে একসময় গুনাহকে আর গুনাহই মনে হয় না। যার কারণে বান্দা সুপথ হারিয়ে ফেলে। আল্লাহ তাআলা প্রবৃত্তির অনুসরণকে শিরকতুল্য অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘আপনি কি তাকে দেখেননি, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে’ (সুরা জাসিয়াহ: ২৩)।আমলের উপর টিকে থাকতে হলে সবার আগে জানা প্রয়োজন আমল এবং গুনাহ একে অন্যের বিপরীত বা শত্রু বলা যায়।আমল

করতে হলে গুনাহ থেকে দূরে থাকতে হয় আর গুনাহ করতে থাকলে আমলের মতো নিয়ামত দূরে চলে যায়।হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'মুমিন ব্যক্তি যখন গুনাহ করে তখন তার কলবে একটি কালো দাগ পড়ে। এরপর সে তওবা করলে, পাপকাজ ত্যাগ করলে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার কলব পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। সে আরও গুনাহ করলে সেই কালো দাগ বেড়ে যায়।আর এই কালো দাগই হলো সেই মরিচা যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন- "কক্ষনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে"(সুরা আল-মুতাফফিফিন:আয়াত ১৪)।(ইবনে মাজাহ,তিরমিজি,মুসনাদে আহমাদ)

তাই সবার প্রথমে কাজ হলো আমাকে গুনাহ চিনতে হবে।এমন কোনো কাজ যেটা হয়তো খুব মারাত্মক গুনাহ কিন্তু আমি সেটাকে গুনাহ মনেই করছি না সেক্ষেত্রে গুনাহটি করার কারণে আমার কোনো আফসোস হবে না ফলে আমি কখনোই গুনাহটি ছাড়তে পারবো না।তাই আগে আমাকে গুনাহ চিনতে হবে এবং সেখান থেকে কোন গুনাহটি আমি করছি তা চিন্হিত করতে হবে ও তা ত্যাগ করতে হবে।

২)তওবা করা:

গুনাহ চিনার ও ত্যাগ করার পর সহীহ নিয়তে সেই গুনাহের জন্য খাস দিলে তওবা করতে হবে।তবে মনে রাখতে হবে, শুধু মুখে মুখে তওবা নয় অন্তর থেকে অনুশোচনা বোধ নিয়ে তওবা করতে হবে।তওবা আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।তওবার ফলে বান্দা তার রবের সন্তুষ্টির দিকে আবারও ফিরে যাওয়ার সুযোগ পায়।আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ও তাঁর বান্দার জন্য হিদায়াতের নতুন পথ উন্মোচন করে দেন। তওবার ফজিলত তো আমরা সবাই জানি।আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١﴾ [النور: ٣١]

'হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।' (সূরা আন-নূর,আয়াত:৩১)

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَيُدۡخِلَكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ﴾ [التحريم: ٨]

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, খাঁটি তাওবা; আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত।' (সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৮)

*এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢﴾ [البقرة: ٢٢٢]

'নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করেন।'(সূরা আল-বাকারা, আয়াত:২২২)।তাই গুনাহ হয়ে যাওয়ার পরপরই আমাকে তওবা করে নিতে হবে।তওবাই হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির নিকটে যাওয়ার প্রথম ধাপ।এছাড়াও অধিক হারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। ইস্তিগফার পড়তে হবে। কারণ ক্ষমা প্রার্থনার কারণে আমাদের জন্য দ্বিনের ওপর অটল থাকা সহজ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করো। অন্তর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ করো।তাহলে তিনি তোমাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন।'(সুরা:হুদ,আয়াত:৩)।রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রতিদিন ৭০ বারের অধিক তওবা ও ইস্তেগফার করতেন। (সহীহ্ বুখারী-৬৩০৭)।

নিচে কিছু ইস্তিগফার দেয়া হলো:

ক)আরবি:أَسْتَغْفِرُ الله

উচ্চারণ: আস্তাগফিরুল্লা-হ।

অর্থ: আমি আল্লাহ্'র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

খ)আরবি: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ (أَنْتَ) التَّوَّابُ الرَّحِيْم

উচ্চারণ: রব্বিগফিরলী ওয়াতুব 'আলাইয়া ইন্নাকা আনতাত্ তাওয়াবুর রহিম।

অর্থ:'হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার তাওবা গ্রহণ করুন। নিশ্চয় আপনি তাওবা গ্রহণকারী, অতি দয়ালু।' (আবু দাউদ:১৫১৬)

গ)আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গে কেউ যদি প্রতিদিন সকাল (ফজরের পরে) ও সন্ধ্যায় (মাগরিবের পরে) পড়ে আর সে ঐদিন মারা যায় ইন শা’ আল্লাহ সে জান্নাতে যাবে।এই গ্যারান্টি দিয়ে গেছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)।(বুখারী,তিরমিযী ৫/৪৬৬)।

আরবি: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আংতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আংতা খালাক্কতানি ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহ্দিকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতাতু আউজুবিকা মিন শাররি মা সানাতু আবুউলাকা বিনিমাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবুউলাকা বিজাম্বি ফাগ্ফিরলি ফা-ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আংতা।'

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আর আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছি তা পূরণ করার চেষ্টায় রত আছি, আমি আমার কর্মের অনিষ্ট থেকে পানাহ্ চাই, আমি স্বীকার করছি আমার প্রতি তোমার প্রদত্ত নিয়ামতের কথা এবং আমি আরো স্বীকার করছি আমার পাপে আমি অপরাধী, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি ছাড়া ক্ষমা করার আর কেউ নাই।

ঘ)দিনের যে কোনো ইবাদত-বন্দেগি তথা ক্ষমা প্রার্থনার সময় এই তাওবাহ-ইস্তেগফারটি করা। হাদিসে এসেছে- এই তাওবাহ-ইস্তেগফারটি করলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন, যদিও সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নকারী হয়।' (আবু দাউদ, তিরমিজি, মিশকাত)।

আরবি: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণ : 'আস্তাগফিরুল্লা হাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কইয়্যুমু ওয়া আতুবু ইলায়হি।'

অর্থ : 'আমি ওই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, যিনি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনো মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং তাঁর কাছেই (তাওবাহ করে) ফিরে আসি।'

৩)দোয়া করা:

দোয়া হলো মুমিনের হাতিয়ার।তাই আমলের তওফিক চেয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে এবং তাঁর কাছে অধিক হারে দোয়া করতে হবে যেন তিনি মৃত্যু পর্যন্ত দ্বিনের ওপর অবিচল রাখেন।রাসুল (সা.) আমাদের বিভিন্ন দোয়া শিখিয়েছেন। কারণ মানুষের মন সর্বদা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে থাকে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিবর্তন করেন।

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي كَعْبٍ، صَاحِبِ الْحَرِيرِ حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، قَالَ قُلْتُ لأُمِّ سَلَمَةَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ عِنْدَكِ قَالَتْ كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ " يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ " . قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لأَكْثَرِ دُعَائِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ قَالَ " يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلاَّ وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ " . فَتَلاَ مُعَاذٌ : (رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا) قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَالنَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَنُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ . قَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَن.

৩৫২২. আবূ মূসা আনসারী (রহঃ) ... শাহর ইবন হাওশাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ আমি উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে বললামঃ হে উম্মুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আপনার কাছে অবস্থান করতেন তখন অধিকাংশ সময় তিনি কি দুয়া করতেন? তিনি বললেনঃ তাঁর অধিকাংশ দু’আ ছিলঃ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

(উচ্চারণঃ ইয়া মুকাল্লিবাল কুলূব ছাব্বিত কালবী আলা দীনিকা)

অর্থঃ হে অন্তর পরিবর্তনকারি! আমার অন্তর তুমি তোমার দীনে সুদৃঢ় রাখ।

তিনি বলেনঃ আমি বললাম,ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অধিকাংশ সময় এই দু’আ কেন করেন যে, ইয়া মুকাল্লিবাল কুলূব ছাব্বিত কালবী আলা দীনিকা? তিনি বললেনঃ হে উম্মু সালামা! এমন কোন মানুষ নেই যার অন্তর আল্লহ ত’আলার অঙ্গুলীসমূহের দুই অঙ্গুলের মাঝে নেই। যাকে তিনি ইচ্ছা তাকে তিনি দিনের উপর কায়েম রাখেন, যাকে ইচ্ছা তিনি সরিয়ে দেন।

রাবি মুআয (রহঃ) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেনঃ

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا

হে আমাদের রব্ব! হেদায়তের পর তুমি আমাদের অন্তর বক্র করে দিও না। (আল-ইমরান,আয়াত:৮)।

সহীহ,যিলালুল জান্নাহ ২২৩,তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ৩৫২২ [আল মাদানী প্রকাশনী]

এছাড়া ও আমলে মন না বসলে কিংবা আগ্রহ কমে গেলে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়তে পারি:

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার তার হাত ধরে বললেন, 'হে মুয়াজ, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালোবাসি; আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালোবাসি। এরপর তিনি বললেন, হে মুয়াজ! আমি তোমাকে অসিয়ত করছি প্রত্যেক নামাজের পর এ দোয়া পড়া থেকে বিরত থাকবে না।তা হলো-

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

'আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা জিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা'।

অর্থ:'হে আল্লাহ! আপনার স্মরণে, আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এবং আপনার উত্তম ইবাদতে আমাকে সাহায্য করুন।'এরপর হজরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু আস-সুনাবিহি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে এবং আস-সুনাবিহি রাহমাতুল্লাহি আবদুর রহমানকে এরূপ দোয়া করার অসিয়াত করেন।'(আবু দাউদ)

অন্তরের পরিশুদ্ধি ও আল্লাহভীতি অর্জনের জন্য একটি দোয়ার উল্লেখ আছে হাদিসে। তা হলো—

اَللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا - اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا

উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা আতি নাফসি তাকওয়াহা ওয়া যাক্কিহা আংতা খাইরু মান যাক্কাহা আংতা ওয়ালিয়্যুহা ওয়া মাওলাহা; আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন ইলমিন লা ইয়ানফাউ ওয়া মিন কালবিন লা ইয়াখশাউ ওয়া মিন নাফসিন লা তাশবাউ ওয়া মিন দাতওয়াতিন লা ইউসতাঝাবু লাহা।'

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমার মনে তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি) দান করো, আমার মনকে পবিত্র কর, তুমিই তো আত্মার পবিত্রতা দানকারী, তুমিই তো হৃদয়ের মালিক ও অভিভাবক। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এমন ইলম

(জ্ঞান) থেকে যা কোনো উপকারে আসে না, এমন হৃদয় থেকে আশ্রয় চাই যা (তোমার ভয়ে) ভীত হয় না, এমন আত্মা থেকে আশ্রয় চাই যা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া থেকে আশ্রয় চাই যা কবুল করা হয় না।' (সহিহ মুসলিম: ৬৬৫৮)।

সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, ইবাদত-বন্দেগি, নেক আমল বা ভালো কাজ করার আগ্রহ ধরে রাখতে সব সময় প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর এ দোয়াটি বেশি বেশি পড়া। আশা করা যায়, হাদিসের অনুসরণ ও অনুকরণে এ দোয়ার বরকতে মহান আল্লাহ বান্দার অন্তরে ইবাদত-বন্দেগি ও ভালো কাজের আগ্রহ বাড়িয়ে দেবেন।

৪)ইলমে নাফী অর্জনের চেষ্টা করা:

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই- اِقْرَأ- পড়, ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি। -তারীখে তাবারী ৬/৫৭২

দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ রয়েছে। একটি ভাগ ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া হিসাবে। ফরযে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয। -মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪।

ঈমান-আকীদা, ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাতসহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যা সকলকেই শিখতে হবে। এই পরিমাণ ইলম শিখে নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। আর অধীনস্তদেরকে শিক্ষা দেওয়াও জরুরি। এ পরিমাণ ইলম না শিখলে আল্লাহর কাছে অন্যকে দায়ী করা যাবে না এবং কোনো ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় প্রকারের ইলম হচ্ছে, ফরযে কেফায়া, যা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয না হলেও সামষ্টিকভাবে সকলের উপর ফরয। অর্থাৎ সমাজের কিছু ব্যক্তি তা হাসিল করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই হাসিল না করলে সকলেই দায়ী থাকবে। এ প্রকারের ইলম অনেক বিস্তৃত। এককথায় দ্বীনের সকল বিষয়ের গভীর জ্ঞান। যেহেতু এটি সামষ্টিকভাবে সকলের উপরই ফরয তাই সকলকেই এই দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকা চাই। কেউ যেন মনে না করে, এটি কেবল অমুক শ্রেণির দায়িত্ব। এই ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ.

এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক উত্তর প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তাঁরা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে। -শরহু মুশকিলিল আছার, হাদীস, ৩৮৮৪; শারাফু আসহাবিল হাদীস, খতীব বাগদাদী, পৃ. ২৯; বুগইয়াতুল মুলতামিস, আলাঈ, পৃ. ৩৪।

ইলমকে বলা হয় মাওকূফ আলাইহি অর্থাৎ দ্বীনের প্রতিটি আমল এর উপর নির্ভরশীল। ইমাম বুখারী রাহ. সহীহ বুখারীতে একটি শিরোনাম দিয়েছেন-

باب العِلمِ قبْلَ القوْلِ والعمل.

(সকল কথা ও আমলের আগে হচ্ছে সেই বিষয়ের ইলম।)

ইলমের ফজীলত বর্ণনা করে রাসূল (সাঃ)বলেন:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

যেই ব্যক্তি ইলম তলবের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে আল্লাহ পাক এর বদৌলতে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯।

এতো এতো হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি ইলম অর্জন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমলে ইখলাস আনতে আমাদেরকে আগে পরিপূর্ণ ইলম অর্জনের চেষ্টা করতে হবে।ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে আমরা আল্লাহর কাছে এই দুয়া করতে পারি যা আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে শিখিয়েছেন-

.رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا

হে আমার প্রভু, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও। -সূরা ত্ব-হা (২০) : ১১৪

৫)নেক সহবতের ব্যবস্থা করা

:মুত্তাকীদের সোহবত দ্বারা কোন ধরনের সোহবত উদ্দেশ্য? সোহবত দ্বারা উদ্দেশ্য, মুত্তাকীদের সাথে এমন সম্পক যে সম্পর্কের কারণে আমার মাঝে নাড়াচাড়া পড়বে। কিন্তু আজকাল মানুষের অভ্যাস হল কোনো আল্লাহওয়ালা বুজুর্গকে দেখল তো তার হাতে বাইআত হয়ে গেল। বাইআত হয়েই নিজের সম্পর্কে একেবারে খুশী । কিছু অযীফা নিয়ে এল। তারপর ওটার উপর আমল করল বা করল না। তো এটা হল মুত্তাকীদের সোহবতের একেবারে নিম্ন পর্যায়। আসলে মুত্তাকীদের সোহবত হল, তাঁর মজলিসে নিয়মিত বসার সৌভাগ্য যদি নাও হয়,তারপরও আমি যেহেতু তাঁর নেগরানী গ্রহণ করেছি, তাঁর তত্ত্বাবধান গ্রহণ করেছি,আমার হালত তাঁকে জানাব। কোনো কিছু লুকাব না। তারপর যে হেদায়েত তিনি আমাকে দেন সেই হেদায়েতের উপর আমল করব। আমল করার মধ্যে ত্রুটি হয়ে গেলে ওটা আবার জানাব। এটা হল সোহবত। এটা যদি কাছে থেকে হয় তাহলে নূরুন আলা নূর। বাংলায় সোনায় সোহাগা। খুব ভালো। আর যদি কাছে থেকে না হয়; বরং দূরে থেকে হয় তাহলেও এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস।সূরা ফুরকানে আল্লাহ বলেছেন,

وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰی یَدَیْهِ یَقُوْلُ یٰلَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِیْلًا۲۷ یٰوَیْلَتٰی لَیْتَنِیْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِیْلًا۲۸ لَقَدْ اَضَلَّنِیْ عَنِ الذِّکْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِیْ ؕ وَ کَانَ الشَّیْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا

‘জালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, আফসোস! আমি যদি রাসূলের সঙ্গে পথ ধরতাম। হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিচ্যুত করেছিল! শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগ করেই থাকে।’ - সূরা ফুরকান ২৭-২৯।

দ্বীনের পথে টিকে থাকতে নেক লোকদের সোহবত অবলম্বন করা খুবই জরুরী। ভালো ভালো নসীহতের কথা শিখার জন্য, স্বভাব-চরিত্র ভালো করার জন্য, আমল-আখলাক দুরস্ত করার জন্য বুযুর্গদের সঙ্গে সংশ্রব রাখা একান্ত দরকার।মানুষকে আল্লাহ তাআলা এইরূপে সৃষ্টি করেছেন যে, ভালো হোক আর মন্দ হোক, অন্যের দেখাদেখি মানুষ অতিশীঘ্র অনেক কিছু শিখে ফেলতে পারে। সুতরাং সৎসঙ্গ অত্যাবশ্যক ও গ্রহণযোগ্য। কুসঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাজ্য।সৎসঙ্গ অর্থ এই যে, এমন লোকের সাথে উঠাবসা করা যারা আবশ্যক পরিমাণ দ্বীনী ইলম শিক্ষা করেছেন। আকীদা মজবুত করেছেন। শিরক ও বিদআত হতে, দুনিয়াদারী ও সন্দেজনক বিষয়টি হতে বেঁচে থাকেন। যারা রোযা, নামায শরীয়তের অন্যান্য আহকাম ঠিকমতো পালন করেন, লোকের সাথে দেনা-পাওনা পরিষ্কার রাখেন, শরীয়তের মাসআলা অনুযায়ী কায়কায়বার করেন, হালাল, হারাম মেনে চলেন, স্বভাব চরিত্র ভালো করেন, সকলের সাথে নম্র ব্যবহার করেন, নিজেকে ক্ষুদ্রাতি থেকে ক্ষুদ্র মনে করেন, কাউকে কোনো কষ্ট দেন না, কাউকে কটু কথা বলেন না।যারা আল্লাহর ভয়ে সর্বদাই ভীত। দুনিয়ার লোভ-লালসা হইতে তাহারা দূরে থাকে।দ্বীন ঈমানের মোকাবেলায় ধন-সম্পত্তি, মান-সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি কোনো কিছুর পরোয়া করেন না। আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার যিন্দেগীর মূল্য তাদের নিকট কিছুই নাই। সর্বাবস্থায় তারা সবর এবং শুকর করে থাকেন, যাদের মধ্যে উক্ত গুণ পাওয়া যাবে তাদের সৎসঙ্গ পরশ পাথর তুল্য। একেই বলে সোহবতে সালেহ বা সৎসঙ্গ।

৬)আখিরাতকে স্মরণ করা:

হাকিমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) লিখেছেন, প্রতিদিন একবার একটু সময় বের করে নামাজের পরে নির্জনে মৃত্যুর ফিকির করা উচিত। ভাবা উচিত এখন আমার জীবনের শেষ সময়। ফেরেশতারা আমার রুহ বের করে নেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। আমি ছাকরাতের অবস্থার সম্মুখীন।হাত-পায়ের নড়াচড়া স্তিমিত হয়ে আসছে। মালাকুল মাওতকে সরাসরি দেখতে পাচ্ছি। অল্পক্ষণেই এই মায়াময় পৃথিবী, অতি প্রিয় ভাইবোন, কলিজার টুকরা সন্তানাদিসহ আমার প্রিয় সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্পূর্ণ অচেনা এক জগতে নিয়ে যাওয়া হবে। মুহূর্তের ব্যবধানে আমার রুহ কবজ করা হয়েছে।যত্নের প্রিয় দেহখানা নিথর পড়ে রয়েছে আমার ঘরের বারান্দায়। আপনজনরা বিচ্ছেদ বেদনায় বিলাপ করছে। পাড়া প্রতিবেশীরা কাফন-দাফনের আয়োজনে ব্যস্ত। অতঃপর আমাকে গোসল দিয়ে কাফন পরানো হচ্ছে।কাফনের কাপড় মেলে শেষবারের মতো সবাই আমাকে দেখছেন। আমার প্রিয় শয়নকক্ষ, ঘর, উঠোন, স্মৃতি বিজড়িত বাড়ির আঙিনা সবকিছু পেছনে ফেলে আমাকে খাটিয়ায় তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জানাজার মাঠে। জানাজার নামাজ পড়ে অন্ধকার কবরে সবাই ধরাধরি করে আমাকে শুইয়ে দিয়ে মাটি দিয়ে কবর বন্ধ করে সবাই যার যার বাড়ির দিকে ফিরছেন। এখন আমি অন্ধকার কবরে একা। এমতাবস্থায় সওয়াল-জওয়াব করার জন্য ফেরেশতারা এসে গেছেন এমনটিই ভাবতে হবে।এরূপভাবে আখিরাতের কথাও চিন্তা করে ভাবতে হবে— কিয়ামত শুরু হয়েছে। আমাকে কবর থেকে উঠানো হচ্ছে, এখন ময়দানে হাশরের দিকে রওনা হয়েছি। সমগ্র মানবজাতি হাশরের ময়দানে উপস্থিত। এখানে অসহনীয় গরম। সূর্য সন্নিকটে, সব মানুষ খুবই পেরেশান, দলে দলে লোকজন নবীদের কাছে সুপারিশ করার জন্য যাচ্ছে, যেন হিসাব-নিকাশ শুরু হয়ে যায়। তারপর এভাবে হিসাব-কিতাব, পুলসিরাত, জান্নাত এবং জাহান্নামের কথা একে একে গভীরভাবে চিন্তা করে।প্রতিদিন সকালে ফজরের পরে এভাবে চিন্তা ফিকির করে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করা, হে আল্লাহ! এখন আমি দুনিয়ার কাজকর্মের জন্য বের হচ্ছি। এমন কোনো কাজ যেন আমি না করে বসি, যে কাজ আমার আখিরাতের জন্য বরবাদ ও ধ্বংস ডেকে

আনে। এভাবে যখন আমরা প্রতিদিন মৃত্যুর কথা চিন্তা ফিকির করবো তখন একদিন এই চিন্তা আমাদের অন্তরে বসে যাবে এবং আমরা আমাদের ইসলাহ এবং নিজেদের আল্লাহ এবং তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁবেদারি ও গোলামির দিকে নিয়ে আসতে পারব।

৭)সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার কমানো:

সোশ্যাল মিডিয়া একদিকে যেমন আমাদের উপকার করে তেমনি এর অতিরিক্ত ব্যবহার আমাদের সময় কে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।তাই এর ব্যবহার আমাদেরকে কমাতে হবে।আর এর কিছু উপায় নিচে দেয়া হলো:

১। ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া জরুরি:আপনি কেন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করছেন? এই উত্তর খুঁজে বের করতে হবে আপনাকেই। বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা, সাম্প্রতিক বিষয় সম্পর্কে তথ্য পাওয়া, পেশাদার নেটওয়ার্ক তৈরি করা ইত্যাদি নানা কারণ থাকতে পারে। আপনি ঠিক কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন সেটা খুঁজে বের করুন। বিষয়টি সম্পর্কে আপনি একবার সচেতন হয়ে গেলে সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়াও উদ্দেশ্যগুলো পূরণ করা যায় কিনা সেটা নিয়ে ভাবতে পারবেন।

২। নির্দিষ্ট সময়সীমা ঠিক করুন:প্রতিদিন সোশ্যাল মিডিয়াতে কতোটা সময় ব্যয় করবেন সেটা ঠিক করুন। সে অনুযায়ী স্মার্টফোনে অ্যাপ টাইমার সেট করে নিন।

৩। নোটিফিকেশন অ্যালার্ট বন্ধ করে দিন:ফোনে সোশ্যাল মিডিয়ার নোটিফিকেশন আসলে বারবার চেক করতে ইচ্ছে হয়। তাই মুঠোফোনে যেন নোটিফিকেশন না আসে সেজন্য সেটিং বদলে দিন।

৪। শখের কাজে সময় ব্যয় করুন:সোশ্যাল মিডিয়ায় সীমাহীন সময় ব্যয় করা কোনও ভালো ফল বয়ে আনে না। নিজের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে তাই অন্যান্য শখের কাজের প্রতি মনোযোগ দিন। বই পড়া, শখের বাগান করা বা অন্য কোনও শখের কাজ থাকলে সেটা নিয়ে সময় কাটান।

৫। বাস্তব যোগাযোগ বাড়ান:অনলাইনে যোগাযোগ করা সহজ, তবে সবসময় এটি খুব স্বাস্থ্যকর নয়। চেষ্টা করুন মানুষের সঙ্গে সামনাসামনি দেখা করে কথা বলতে। কথা বলার সময় ফোন ব্যবহার করবেন না, অন্যদেরকেও উৎসাহিত

করবেন প্রয়োজন ছাড়া ফোন ব্যবহার না করার জন্য। পরিবারের সঙ্গেও সময় কাটান। একসঙ্গে রাতের খাবার খান, নির্মল কথা বলুন,কুরআন হাদীসের তালিম করুন। এই সময় হাতের কাছে স্মার্টফোন রাখবেন না।

৬। কেনাকাটার পেইজগুলো প্রয়োজন ছাড়া লাইক দেবেন না:শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, গয়না, গ্যাজেট বা অনলাইন কেনাকাটার সাইটগুলোর পেইজ লাইক করবেন না। অযথা বিজ্ঞাপন আসলে সেগুলো হাইড করে দিন।

৮)কুরআনকে আকড়ে ধরা:

কুরআন মাজীদ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র কালাম। যারা আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করে, এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা তথা তাদাব্বুর-তাফাক্কুর করে, কুরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণ করে, কুরআন শিক্ষা দেয় এবং পারস্পরিক কুরআনের চর্চা করে আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যন্ত খুশি হন। তাদের উপর বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন, তাদের অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দেন।কুরআন হলো অন্তরের নূর।কুরআন মানুষের অন্তর নরম করে ও ইমান বৃদ্ধি করে।ফলে গুনাহ করার ইচ্ছা কমে যায় এবং আমলের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ ...
السّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرّحْمَةُ وَحَفّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَه.

.."আর যারা আল্লাহর ঘরে একত্র হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পারস্পরিক কুরআনের চর্চা করে, তাদের প্রতি 'সাকীনা' তথা এক প্রকার বিশেষ প্রশান্তি বর্ষিত হয়, রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর কাছের ফিরিশতাদের মাঝে তাদের আলোচনা করেন"। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯।

আল্লাহ তাআলা কুরআনের সাথে মুমিনের সম্পর্কের চিত্রায়ণ করেছেন অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিমায়-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমানের উন্নতি সাধন করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। -সূরা আনফাল (০৮) : ০২

নবীজী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। হাদীস ও সীরাতের কিতাবে এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। নামাযে, নামাযের বাইরে, রাতের আঁধারে, দিনের আলোতে সর্বাবস্থায় তিনি তিলাওয়াত করতেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, নামাযে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নবীজী এত দীর্ঘ সময় তিলাওয়াত করতেন যে, তাঁর পা মুবারক ফুলে যেত। (দ্রষ্টব্য : সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮১৯, ২৮২০)

তাই আমরা যতো বেশি কুরআন পড়বো ততো আল্লাহর দ্বীনের নিকটবর্তী হবো এবং আমলের প্রতি দৃঢ় হতে পারবো।

৯)সালাতে নম্র ও বিনয়ী হওয়া:

কালিমার পরে সালাত হলো ইসলামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন।সালাত ইসলাম এবং কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

»بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة«

“মানুষ এবং শির্ক কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য সালাত ছেড়ে দেওয়া”। (সহীহ মুসলিম)। সালাত এমন একটি ইবাদাত যা মানুষকে সকল অপকর্ম থেকে রক্ষা করে।আল্লাহ তায়া’লা বলেন:নিশ্চয়ই সালাত অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। (সূরা আনকাবুত : ৪৫)।তবে এই সালাত হতে হবে বিনয়ী ও নম্রতার সঙ্গে।হযরত উমর রা.-এর প্রসিদ্ধ বাণী-

إنّ أَهَمّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصّلَاةُ. فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا، حَفِظَ دِينَهُ. وَمَنْ ضَيّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَع.ُ

নিশ্চয়ই আমার কাছে তোমাদের সবচে’ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সালাত। যে ব্যক্তি সালাতের হেফাযত করল, যত্ন সহকারে তা আদায় করল, সে তার দ্বীনকে হেফাযত করল। আর যে তাতে অবহেলা করল, (দ্বীনের) অন্যান্য বিষয়ে সে

আরো বেশি অবহেলা করবে। -মুয়াত্তা মালেক, বর্ণনা ৬; মুসান্নাফে আবদুর রযযাক, বর্ণনা ২০৩৮।সালাত এর দ্বারা যেমন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার পাথেয় অর্জন হয়, সংকল্প করার তাওফীক হয় তেমনি এ কারণে গুনাহও মাফ হয়। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

الصّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُن.ّ

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায তার মাঝের গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩১।তাই আমাদেরকে সালাত আদায় করতে হবে খুশুখুজুর সঙ্গে। আল্লামা আলূসী রাহ. বলেন-

الخشوع التذلل مع خوف وسكون للجوارح.

'খুশূ' হল, অন্তরের ভয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতার সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় প্রকাশ করা। -রূহুল মাআনী ৯/২৭৫।প্রখ্যাত মুফাসসীর হাফেয ইবনে কাসীর রাহ. বলেন, সালাতে খুশূ-খুযূর দৌলত তাঁরই হাছিল হয়, যে নিজের অন্তরকে সবকিছু থেকে ফিরিয়ে শুধু সালাতের মধ্যেই নিবিষ্ট রাখে। -তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/২৯৫।যখন কেউ এমন খুশূ-এর সাথে সালাত আদায় করে তখনই সালাত তার চক্ষু শীতল করে, অন্তরের প্রশান্তির কারণ হয়। যেমনটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

جُعِلَتْ قُرّةُ عَيْنِي فِي الصّلَاة.ِ

সালাতেই দান করা হয়েছে আমার চক্ষুর শীতলতা। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১২২৯৩; সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৯৩৪০।অন্য হাদীসে বেলাল রা.-কে সম্বোধন করে বলেছেন,

يَا بِلَالُ! أَقِمِ الصّلَاةَ، وَأَرِحْنَا بِهَا.

সালাতের ব্যবস্থা করে আমাকে শান্তি দাও, হে বেলাল!। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৮৫।এটাই তো সালাত সম্পর্কে একজন মুমিনের অনুভূতি হওয়া উচিত। সালাত তার জন্য এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল, অন্তরের প্রশান্তি, শান্তির আধার। পক্ষান্তরে মুনাফিক এবং যারা সালাতে খুশূ-খুযূ অবলম্বন করে না তাদের জন্য সালাত মহা কঠিন কাজ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْن.َ

সালাতকে অবশ্যই কঠিন মনে হয়। তবে খুশূ-খুযূ (অর্থাৎ ধ্যান ও বিনয়)অবলম্বনকারীদের জন্য নয়। -সূরা বাকারা (২) : ৪৫

আরেক আয়াতে মুনাফিকদের চরিত্র সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

وَ اِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا.

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায় আর আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। -সূরা নিসা (৪) : ১৪২

তো নামাযে খুশূ-খুযূ মুমিনের গুণ। পক্ষান্তরে খুশূ-খুযূ বিহীন অলসতার সাথে নামায মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। আর খুশূ-খুযূ ওয়ালা নামাযই নামাযীকে সকল অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে।আসলে মুমিনের নামায খুশূ-খুযূ বিহীন হতেই পারে না; কারণ সে তো মহান প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কি দেহ-মন বিনীত না হয়ে পারে? আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কি মুমিন আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো দিকে মনোনিবেশ করতে পারে? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী অপূর্ব শৈলিতে এ কথায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন-

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي إِنَّمَا يَقُومُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِيه.

তোমাদের কেউ যখন নামাযে দণ্ডায়মান হয় তখন সে তার রবের সাথে একান্তে আলাপ করে। সুতরাং তার উচিত সে কিভাবে আলাপ করছে সেদিকে যথাযথভাবে লক্ষ রাখা। -মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৮৬১; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ৪৭৪।এথেকে বুঝা যায়,আমলের ধারা ঠিক রাখতে সালাতে বিনয় ও নম্রতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

১০)তাকওয়া অর্জন করা:

তাকওয়া হলো আল্লাহ ভীতি।যার অন্তরে যত বেশি তাকওয়া সে ততো আল্লাহর নিকটবর্তী ও গুনাহ থেকে দূরবর্তী। কিন্তু এই তাকওয়া অর্জন করা বেশ কঠিন।একমাত্র মুমিন দের দ্বারাই সম্ভব অন্তরে তাকওয়া নিয়ে চলা।এবার আমরা জানি তাকওয়া কিভাবে অর্জন করতে হয়,তাকওয়া অর্জনের সবচেয়ে মজবুত হাতিয়ার কী? তাকওয়া অর্জনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার দুআ, মুত্তাকীদের সোহবত, হিম্মত ও আল্লাহর মুহাববত । এ চারটা বিষয়। আমরা ধোঁকায় থাকি,

গাফিলতে থাকি, এজন্য আমাদের কাছে সবই কঠিন মনে হয় । কিন্তু যদি চিন্তা করা হয় তাহলে দেখা যাবে, এ চারটার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন হল, হিম্মত। আবার হিম্মতের চেয়ে কঠিন চেষ্টা করা। আপনার মধ্যে ন্যূনতম যে হিম্মত আছে সেটাকে কাজে লাগান এবং আরেকটু আগে বাড়ুন। ওটাকে কাজে লাগিয়ে আরেকটু আগে বাড়ার চেষ্টা করুন। তো হিম্মত অনেক শক্তিশালী নিআমত। শুধু একটু তাওয়াজ্জুহ দরকার।বিভিন্ন দোষক্রুটি ত্যাগ করার ইচ্ছা মানুষ এই ভেবে বাদ দেয় যে, অভ্যাস হয়ে গেছে। অভ্যাস ত্যাগ করা খুব কঠিন। সব কঠিনের পেছনে কারণ হল, আমরা এই চার হাতিয়ার কাজে লাগাই না। শুধু একটাকে লাগাই। শুধু দুআ করি। শুধু দুআ এমন হাতিয়ার যা একা কখনো যথেষ্ট নয়। শুধু দুআর হাতিয়ার কাজে লাগানো মানে দুআর নাশোকরি করা।আসল দুআ তো হল, দিল হাযির রেখে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া।

ُأَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاه

'বল তো কে নিরুপায় মানুষের ডাকে সাড়া দেন 'যখন সে ডাকে' (সূরা নামল ২৭ : ৬২)।ইযতিরারী হালত বা নিরুপায় অবস্থা যখন মানুষের পয়দা হবে, দিল হাযির রেখে যখন মানুষ দুআ করবে তখন যত বড় নাস্তিক হোক আল্লাহ সাথে সাথে দুআ কবুল করে নিবেন। আর এই ইযতিরারী হালত তখন পয়দা হবে, যখন আপনি অন্য সকল হাতিয়ারকে কাজে লাগাবেন। এসকল হাতিয়ার ব্যবহার করা ছাড়া ইযতিরারী হালত বা নিরুপায় ভাব পয়দা হওয়া কখনো সম্ভব না। সেজন্য শুধু এক হাতিয়ার ব্যবহার করা যেন কোনো হাতিয়ারই ব্যবহার না করা।এরপর প্রয়োজন নেক সহবত।যাদের সঙ্গে থাকলে অন্তর আল্লাহর কথা স্মরণ করে।যে মানুষগুলো আল্লাহ ও তার রাসূলের পথে চলতে সাহায্য করে এমন মানুষের সাথে চলাফেরা করা।দিলে আল্লাহর মুহাববত বাড়াতে হবে।দুনিয়াতে স্বভাবগতভাবেই মানুষের কারো না কারো প্রতি টান থাকে, দুর্বলতা থাকে। সেটার উপর কেয়াস করে আপনি আল্লাহর মুহাববতটাকে বুঝতে পারেন।কারো প্রতি আপনার দুর্বলতা থাকলে আপনি তার সাথে কেমন আচরণ করেন? অথচ সে মাখলুক। আপনার উপর তার যদি কোনো ইহসান থাকেও তাহলে তা আল্লাহর তাওফীকে হয়েছে এবং ঘুরেফিরে তার সকল ইহসান আল্লাহর

দিকেই যাবে। এরপরও তার প্রতি আপনার এত রেয়ায়েত, এত দুর্বলতা ! আল্লাহ রাববুল আলামীনের নিআমতে তো সেও ডুবে আছে, আপনিও ডুবে আছেন। তার প্রতি যদি আপনার এত মুহাববত হয় তাহলে আল্লাহর সাথে আপনার মুহাববত কেমন হবে? কেমন হওয়া উচিত?স্বভাবগতভাবেই মানুষের মধ্যে আল্লাহর মুহাব্বত সবচেয়ে বেশী থাকে। কিন্তু আল্লাহর নিআমতের কথা স্মরণ না করার কারণে সেই মুহাব্বত চাপা পড়ে থাকে। আল্লাহর মুহাববত বাড়ানোর চেষ্টা করতে গেলেই মানুষ একটা ধাক্কা খায়। হয়ত কখনো গোনাহ হয়ে গেলে ধাক্কা যাবে। অথবা কখনো নেক আমল ছুটে গেলে ধাক্কা যাবে। এভাবে ধাক্কা খাবে একবার, দুইবার, তিনবার, চারবার। তারপর আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। এটা অনেক বড় একটা কৌশল। আল্লাহর মুহাববত বাড়াতে হবে এবং মুহাববতটাকে হাযির করতে হবে। অনুশীলন করতে করতে মুহাববতটাকে হাযির করতে হবে। আমার আল্লাহ নারায হবেন- এই ভেবে গোনাহের কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। আমার মুরুববী যদি আমাকে এই কাজটা করতে দেখেন, তাহলে তিনি কী ভাবতেন? আমি কি এই কাজটা তার সামনে করতে পারতাম? অথচ মুরুববী আমার চোখের আড়ালে আর আমিও তার চোখের আড়ালে। তো একজন মুরুববীর বেলায় যখন এ কথা ভাবতে পারি তাহলে আমার আল্লাহ সম্পর্কে কি এ কথা ভাবতে পারি না? আমার আল্লাহ তো আমাকে সব সময় দেখেন। তিনি আমার চোখের আড়ালে হলেও আমি তো আল্লাহর চোখের আড়ালে না। فان لم تكن تراه فإنه يراك

‘তুমি যদিও তাকে দেখ না, তিনি তো তোমাকে দেখেন’।

আরেক হাতিয়ার, হিম্মত। যতটুকু হিম্মত আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন তা কাজে লাগান এবং এভাবে আগে বাড়তে থাক। হিম্মত এমন এক শক্তি যার মোকাবেলা করার মত অন্য কোনো শক্তি দুনিয়াতে নেই। এই যে সিগারেটের অভ্যাস। কত মানুষ সিগারেটের অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছে। নিয়ত করে, খাবে না, আবার শুরু করে । আবার নিয়ত করে, খাবে না, আবার শুরু করে। এভাবে শেষবার যখন বলে- নাহ্, আর খাব না। তখন আর খায় না। তো এই হিম্মতটা আল্লাহর কাছে অনেক দামী। হিম্মতের সাথে আল্লাহর রহমতের খুব বেশী সম্পর্ক। হিম্মত হলে আল্লাহর রহমত আসে। গোনাহ থেকে বাঁচার, তাকওয়া হাসিল করার যত উপায়

আছে এর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর হল হিম্মত করা। আল্লাহ দেখছেন, বান্দা আমার জন্যে চেষ্টা করছে।

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

এ আয়াতের 'সা'আ লাহা'-এর দ্বারা হিম্মত বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এই হিম্মতের কদর করবেন- এই ওয়াদা আল্লাহ তাআলা আগেই দিয়েছেন। বান্দা হিম্মতকে কাজে লাগালে আল্লাহ বলেন, আমি হিম্মতের শোকর করব। এজন্যে দেখা যায়, বান্দা যখন তার সর্বোচ্চ হিম্মতকে কাজে লাগায়, তখন সে সফল হবেই। হিম্মতের সাথে আল্লাহর ওয়াদা ।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

'যে মুজাহাদা করবে আমি তাকে আমার পথে পরিচালিত করব'। (সূরা আনকাবূত ২৯ : ৬৯)।

এখানে অর্থ হল, আল্লাহ তাআলা তার পথে পরিচালিত করবেন।এখানে বলা হয়েছে মোজাহাদা করার কথা। আর আসল মোজাহাদা হল হিম্মত ব্যবহার করা। বান্দা তার হিম্মত ব্যবহার করলে আল্লাহর নুসরত আসবেই।আর এভাবেই তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে আমরা আমলে সালেহ করতে পারবো।

১১)নজরের হিফাজত করা:

গুনাহের সয়লাবের এই যুগে দৃষ্টি তথা 'নজরের হেফাজত' এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। পবিত্র কুরআন থেকে নিয়ে হাদিস, আছার এবং আত্মশুদ্ধির খেদমতে নিয়োজিত সকল মনীষী বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়ার কারণ হলো, একজন মুমিনকে ঘায়েল করার জন্য শয়তান সবচেয়ে কার্যকরী যে অস্ত্রটি ব্যবহার করে, তা হচ্ছে এই দৃষ্টি তথা নজর।বুজুর্গদের অনেকেই যাকে গুনাহ তথা শয়তানের দরজা বলে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ বর্তমানের বাস্তবতা হলো, সাধারণ থেকে বিশেষ; সকল শ্রেণির মুমিন ব্যাপকহারে এই গুনাহে আক্রান্ত। এর বহুবিদ কারণের অন্যতম হলো, এর আলোচনা কম হওয়া, নজরের গুনাহকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, এর ভয়াবহতা এবং নজর হেফাজতের উপকারীতা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা।কুদৃষ্টি ধীরে ধীরে অন্তরকে শক্ত করে দেয়।ফলে আমলের প্রতি আর আগ্রহ জন্মায় না।তাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِم

মুমিন পুরুষদের বলে দিন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি নিচু রাখে। (সূরা আন নুর - ২৪:৩০)।

কুদৃষ্টি থেকে মুক্তির সর্বোত্তম ওষুধ হচ্ছে দৃষ্টি নিচু রাখা। সুতরাং মুমিনদের উচিত রাস্তাঘাটে, বাজারে চলার সময় স্বীয় দৃষ্টি নিচু রাখার অভ্যাস করা। পায়ে হেঁটে চলার সময় শুধু পথের দিকে দেখবে। বাহনে আরোহণ অবস্থায় দৃষ্টি এই পরিমাণ উঠাবে যাতে অন্যান্য বাহন ও পথিকদের অতিক্রমণ সম্পর্কে অবগত হতে পারে। কারও চেহারার দিকে দেখবে না। কেননা ফিতনার সূচনা এখান থেকেই হয়। যদি ভুলে দৃষ্টি পড়ে যায় তাহলে ইস্তেগফার পড়বে এবং পুনরায় দৃষ্টি নিচু করে নেবে। এতে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকবে, যাতে তা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। যদি অফিসিয়াল কোনো কাজ বা কেনাকাটার সময় কোনো নারীর সাথে কথা বলার প্রয়োজন পড়ে তাহলে তার চেহারার দিকে দৃষ্টি দেবে না। যেমন পরস্পরের প্রতি অসন্তুষ্ট দুই ব্যক্তি কোনো অপারগতার কারণে কথা বললেও কেউ কারও মুখের দিকে তাকায় না, চোখে চোখ রেখে কথা বলে না।আর এভাবেই একজন মুমিন তার নজর হিফাজত করতে পারে।

১২)গান-বাজনা পরিহার করা:গান

হলো অন্তরের মদ।যা ধীরে ধীরে অন্তর কে কঠিন করে তোলে।ফলে আমল কিংবা দ্বীনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে যায়।এমন কিছু গান রয়েছে যা সরাসরি শিরকের কথা বলে।আবার কিছু গানে যিনার প্রচার।যার কোনোটিই ইসলাম সমর্থন করে না।আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [لقمان: ٦]

“মানুষের মাঝে কেউ কেউ এমন আছে যে আল্লাহর রাস্তা (ইসলাম) থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার কথা খরিদ করে” [সূরা লুকমান, আয়াত: ৬]

ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আল্লাহর কসম করে বলেছেন, উক্ত আয়াতে ‘অসার কথা’ বলতে গানকে বুঝানো হয়েছে।[1]।

আবু আমির ও আবু মালিক আল-আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«َلَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ»

“অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে এমন অনেক গোষ্ঠী হবে, যারা ব্যভিচার, রেশম ব্যবহার, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল গণ্য করবে” ।[2]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঢোল-তবলা বাজাতে নিষেধ করেছেন[4] এবং বাঁশিকে দুষ্ট লোক ও বোকার কণ্ঠস্বর নামে আখ্যায়িত করেছেন।[5]

আধুনিক বাদ্যযন্ত্রসমূহ নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধ বাণীর আওতায় পড়ে। যেমন, বেহালা, একতারা, দোতারা, তার্প, পিয়ানো, গিটার, ম্যান্ডেলিন ইত্যাদি। এ যন্ত্রগুলো বরং হাদীসে নিষিদ্ধ তৎকালীন অনেক যন্ত্র থেকে অনেক বেশি মোহ ও তন্ময়তা সৃষ্টি করে। এমনকি বাদ্যযন্ত্রের নেশা মদের নেশা থেকেও অনেক বড় হয়ে দাঁড়ায়। যেমনটি ইবনুল কাইয়্যেম ও অন্যান্যরা বলেছেন।আর যদি বাদ্যযন্ত্রের সাথে গান ও সুর সংযোজিত হয় তাহলে পাপের পরিধি বেড়ে যাবে, হারামও কঠিন হবে। সেই সাথে গানের কথাগুলো যদি প্রেম-ভালোবাসা, রূপচর্চা, যৌন উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী ইত্যাদি বিষয়ে হয় তাহলে তো মুসীবতের কোনো শেষ নেই।এ কারণেই আলেমগণ বলেছেন, গান ব্যভিচারের বার্তাবাহক এবং অন্তরে কপটতা সৃষ্টিকারী। মোটকথা, বর্তমান কালে গানের কথা, সুর ও বাদ্য এক বিরাট ফিতনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।কিন্তু মানুষ একে বড়োই তুচ্ছ মনে করে।তাই ইমান নিয়ে চলতে হলে এই ফিতনা থেকে বেড়িয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে।

১২)দান-সাদাকা করা:

দান-সদকা করলে মনে শান্তি আসে । দানের কারণে নানান বাল- মুসিবত থেকে মহান রব আমাদের হেফাজত করেন। দান করলে ধন বেড়ে যায়, কমে না। তাই দানের হাত প্রসারিত করলে আমাদের ও প্রতিবেশি গরীব-দুঃখীসহ অনেকের উপকার হয়। মহান রব বলেন, "যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-সদকা কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি গোপনে ফকির-মিসকিনকে দান করে দাও, তবে আরো বেশি উত্তম। আর তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।’ (সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৭১)।তাই দান করলে আমাদের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

আর সদকা কাকে বলে? ইসলামি পরিভাষায় দান করাকেই সদকা বলা হয়। সদকা শব্দটি এসেছে আরবি ‘সিদকুন’ থেকে। অর্থ: সত্যতা, যথার্থতা। পরিভাষায় সদকা বলা হয়, একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করার লক্ষ্যে স্বীয় সম্পদ ব্যয় করা। কারণ, মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু এবং জীবন যাপনের প্রধান উপকরণ কষ্টার্জিত মাল ব্যয় করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভালোবাসা এবং তার নির্দেশাবলীর প্রতি আনুগত্যের বাস্তব প্রমাণ দিয়ে থাকেন বলে এই ব্যয়কে সদকা নামে অভিহিত করা হয়েছে। পবিত্র কোরআন হাদীসে অত্যাবশ্যক এবং ঐচ্ছিক এ উভয় প্রকার দানকেই সদকা বলা হয়েছে। তবে প্রচলিত অর্থে শুধুমাত্র ঐচ্ছিক নফল দানকেই সাদাকা বলা হয়ে থাকে।সাদাকার প্রকার: সাদাকা দুই প্রকার। (১) সাধারণ সাদাকা (২) সাদকায়ে জারিয়া। গরিব দুঃখীকে টাকা পয়সা দান করা, ভালো ব্যবহার করা সাধারণ সাদাকার অন্তর্ভুক্ত। আর সাদকায়ে জারিয়া বলা হয় ঐ সমস্ত সৎকর্ম যেগুলোর কল্যাণকামিতা স্থায়ী হয়। এর মধ্যে সর্বাগ্রে হচ্ছে দ্বীনি এলেম শিক্ষা দান, দ্বীনি বই পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করে সর্ব সাধারণের মধ্যে এলেম পৌঁছানো। কারণ, দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে মানব সন্তানের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর বিষয় হচ্ছে, আল্লাহর সঙ্গে, তাঁর বিধি বিধানের সঙ্গে এবং রাসূলের সঙ্গে পরিচিতি লাভ। এক ব্যক্তি অন্যকে যদি দ্বীনি এলেম শিক্ষা দেন তবে সে ব্যক্তি নিজে আমল করবে এবং প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক পরবর্তী কাউকে না কাউকে শিক্ষা দেবে। এভাবে কেময়ামত পর্যন্ত এ সৎ কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

হজরত মুহম্মদ (সা.) ঐ ব্যক্তিকে সর্বাপেক্ষা বড় দাতারূপে আখ্যায়িত করেছেন যিনি পবিত্র কোরআন সুন্নাহর এলেম অন্যদেরকে শিক্ষা দেন। তার পরের স্থান মসজিদ, এতীমখানা, মাদ্রাসা, রাস্তা ঘাট, সেতু পুকুর প্রভৃতি গণকল্যাণমূলক খাতে দান করা। এসবের দ্বারা অনেক বেশি লোক উপকৃত হন এবং উপকারটুকু দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। হজরত আবু হুরায়াহ (রা.) বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রাসূল পাক (সা.) বলেন, ‘যখন কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি ব্যতিত, সদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান ও সৎকর্মশীল সন্তান যে

তার জন্য দোয়া করে।' (সহিহ মুসলিম শরীফ, হাদিস নং-১৬৩১)।তাই আমলে দৃঢ় থাকতে আমরা বেশি বেশি দান সাদাকা করার চেষ্টা করবো।

উপসংহার

আল্লাহর সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার মনোনীত দ্বীন ইসলাম আমাদের জন্য অনেক বড় একটি নিয়ামত।যার শুকরিয়া আদায় করে আমরা জীবনেও শেষ করতে পারবো না।কিন্তু ইবলিশের ধোঁকায় পড়ে আমরা বারবার দ্বীনের পথ থেকে সরে যায়।বারবার হারিয়ে ফেলি আমাদের জীবনের লক্ষ্য।শেষ করে ফেলি আমাদের আমল আখলাক।কিন্তু আমাদের রব রহমান,তিনি তাওয়াব।আজ হোক বা কাল আমাদেরকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।তাই এখন থেকেই আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করি।চেষ্টা করি আমাদের আমলকে আবারও সুন্দর করে সাজাতে।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদেরকে বেশি থেকে বেশি আমলে সালেহ করার তওফিক দান করুক ও আফিয়্যাতের সঙ্গে কবুল করুক আমাদের প্রতিটি দুয়া,রহমতের চাদরে ঢেকে দিক আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতকে।আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন।